বিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকের কথাসাহিত্য: মুসলিম নারী ও ইসলামি শরিয়ত

[সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (১৯৩০-২০১২), আবুল বাশার (১৯৫১), আফসার আহমেদ (১৯৫৯-২০১৮)]

এম. ফিল (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ) উপাধির জন্য প্রদত্ত অভিসন্দর্ভ

আবিদা সুলতানা

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১২৪৬০৮ (২০১৩-২০১৪)

ক্রমিক নং : MPC0194017

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা : ৭০০০৩২

মে, ২০১৯

Declaration

I, Abida sultana, hereby declare that the contents of this dissertation, বিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকের কথাসাহিত্য: মুসলিম নারী ও ইসলামি শরিয়ত [সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (১৯৩০-২০১২), আবুল বাশার (১৯৫১-), আফসার আহমেদ (১৯৫৯-২০১৮)] have been written by me under the supervision of Professor Sujit Kumar Mandal. No part of this dissertation has been published anywhere or submitted for any other degree/diploma anywhere/elsewhere.

আবিদা সুলতানা

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা : ৭০০০৩২

মে, ২০১৯

বিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকের কথাসাহিত্য: মুসলিম নারী ও ইসলামি শরিয়ত

[সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (১৯৩০-২০১২), আবুল বাশার (১৯৫১-), আফসার আহমেদ (১৯৫৯-২০১৮)]

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
ভূমিকা	১-৪
প্রথম অধ্যায় : ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপট ও বাঙালি মুসলমান সমাজ	৫-২৪
দ্বিতীয় অধ্যায় : ইসলামি আইনের প্রেক্ষাপট ও বাঙালি মুসলিম নারী	২৫-৪৭
তৃতীয় অধ্যায় : বিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকের কথাসাহিত্যে মুসলমান নারী	৪৮-৭৯
উপসংহার	৮০-৮৫
গ্রন্থপঞ্জি	৮৬-৯১

নিবেদন

এই গবেষণা পত্রটি প্রস্তুত করার জন্য যে সমস্ত বিশেষজ্ঞ, ব্যক্তিবর্গ এবং গ্রন্থাগারিক সহযোগিতা, উৎসাহ, এবং প্রেরণা দিয়ে আমাকে ঋদ্ধ করেছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করলে কাজটি সম্পূর্ণ হবে না। সর্বাগ্রে আমি যার কথা উল্লেখ করতে চাই তিনি হলেন আমার এই গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক সুজিত কুমার মণ্ডল মহাশয়। স্যারের সহযোগিতা এবং অনবরত তাগিদা ছাড়া আমার এই কাজটি কোনও ভাবেই সঠিক সময়ে সম্পূর্ণ হত না। এছাড়া অধ্যাপক সুমিত কুমার বড়ুয়া, যিনি আমাকে এই গবেষণার বিষয় নির্বাচন থেকে শুরু করে লাইব্রেরীতে নিয়ে গিয়ে অনেক বইপত্র অবধি জোগাড় করে দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, বিভিন্নভাবে উৎসাহ দিয়েছেন। বাংলা বিভাগের মাননীয় অধ্যাপক বরেন্দু মণ্ডল স্যারের সহযোগিতা ও উৎসাহ পুরোকাজটি সম্পন্ন করতে অনেকাংশে সাহায্য করেছে বইপত্রের নাম থেকে শুরু করে কাজের ভুলত্রুটি স্নেহের সঙ্গে সংশোধন করে দিয়েছেন। সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আর যাদের সহযোগিতা ছাড়া আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি অবধি আসতে পারতাম না তাঁরা হলেন আমার বাবা মা ভাই এবং পরিবার। আমার কাছে এমন কোনও শব্দ নেই যার দ্বারা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি তাঁদের ঋণ শোধ করতে পারব। এই গবেষণার বিষয়টি আমার মাথাতে এসেছিল বাবার কাছ থেকেই। গ্রামের মুসলিম মেয়েরা কিভাবে তালাক প্রথার বলি হত সেই গল্প ছোট থেকেই বাবার কাছে শুনেছি। পুথিগত শিক্ষা তাঁর কম হলেও ছোটোবেলা থেকেই আমাকে বলতেন মুসলিম সমাজের স্থবিরতা থেকে মুক্তির পথ খোঁজার কথা, প্রগতির কথা। আমার বাবার সেই ভাবনার সূত্র ধরেই আমার মাথাতে গেঁথে গিয়েছিল ভবিষ্যৎ এ যদি কখনও গবেষণার কাজ করি তো মুসলিম সমাজ নিয়েই কিছু করব। একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামের মুসলিম পরিবারে বেড়ে ওঠার সুবাধে মুসলিম মেয়েদের দুর্দশার চিত্রটাই সবচেয়ে বেশি চোখে পড়েছে। এই সব কিছুই অভিসন্দর্ভটি লিখতে আমাকে বিভিন্নভাবে প্রেরণা যুগিয়েছে।

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ সেইসমস্ত গ্রন্থাগারিক এবং প্রকাশকদের প্রতি, যারা সময়ে অসময়ে আমাকে বইপত্রের সন্ধান দিয়ে সাহায্য করেছেন। বিশেষ করে বাংলা বিভাগের গ্রন্থাগারিক আইভি ম্যাডাম এবং হরিশ স্যার, যাদের সাহায্য ভোলা যায় না। এছাড়া আমার বিভাগীয় গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, এবং মানবীবিদ্যা বিভাগের গ্রন্থাগার, আরামবাগ জেলা গ্রন্থাগার, গড়ফা সাধারন পাঠাগার, এই সমস্ত গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষকে অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে গ্রন্থাগার ব্যবহার ও অন্যান্যভাবে সাহায্য করার জন্য। আর আমি কৃতজ্ঞ বিশ্ববঙ্গীয়, কথাপ্রকাশ, অভিযান প্রকাশনার প্রকাশকদের কাছে। আমার গবেষণার বিষয় শোনার পর তারা সবরকমভাবে সাহায্য করেছেন বইপত্র জোগাড় করতে।

আর সবশেষে যাদের ঋণ কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না তারা হল আমার সহপাঠী এবং বন্ধুবান্ধব। বাড়ি থেকে দূরে থাকার জন্য না চাইতেই আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছে। এরা হল আশা, অঙ্কিতা, নবনীতা, মৌ, আবির, উমা, গুলজার, সমর্পিতা। আর যার সহযোগিতা এবং উৎসাহ আমাকে সর্বদা ঋদ্ধ করেছে সে হল আমার প্রিয় বন্ধু আরমান। আমাকে বাংলা টাইপ শেখানো থেকে শুরু করে বইমেলা, বইপাড়া ঘুরে বইপত্র জোগাড় করে দেওয়া অবধি সবসময় আমাকে সহযোগিতা করেছে। এদের সকলের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ভূমিকা

ক্রমবর্ধমান আধুনিক সভ্যতার আলোকে দাঁড়িয়ে বাঙালি মুসলিম মেয়েদের দূরাবস্থার বড়ো কারণ হল আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা। বিশ্ববিদ্যালয় স্তর গুলিতে বাঙালি মুসলিম মেয়েদের সংখ্যা শতকরা একভাগের বেশি নয়। কিন্তু এই সামান্য সংখ্যক মুসলিম মেয়েদের নিয়ে তো মুসলিম সমাজের পরিধি বিস্তীর্ণ নয়। এদের বাইরে মুসলিম সমাজের বিরাট ক্যানভাসে নিম্নমধ্যবিত্ত, দরিদ্র পরিবারের মুসলিম মেয়েদের সংখ্যাটাই সব থেকে বেশি। এই সমস্ত পরিবারের মেয়েরা শুধু যে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দের অভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে থেকে পিছিয়ে রয়েছে তা নয়, বরং এদের শিক্ষা ক্ষেত্রে সবচেয়ে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে সামাজিক এবং ধর্মীয় বিধিনিষেধ। শিক্ষার পথে মেয়েদের বাধা, তালাক প্রথার ছোবল, বিবাহের জন্য বাধ্যবাধকতা, সপত্নী সমস্যা, উত্তরাধিকার প্রশ্নে অসমতা, প্রভৃতি সমস্যাগুলি মুসলিম সমাজ থেকে পুরোপুরি উচ্ছেদ হয়নি। সেকারণে আধুনিক শিক্ষার আলোকে গুটিকতক মুসলিম নারী-পুরুষের দৃষ্টিতে তালাক, বহুবিবাহের মতো প্রথা গুলির গুরুত্ব হারিয়েছে, কিন্তু সমাজের বৃহৎ অংশের নারীদের জীবনে এই সমস্যা গুলির অভিঘাত কতখানি গভীর তার পরিচয় পাওয়া যায় মুসলিম নারীদের সামাজিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে।

অবশ্য সমাজে নারীদের দূরাবস্থার চিত্র শুধুমাত্র বাঙালি মুসলিম পরিবারের মেয়েদের তা নয়, বরং আধুনিক শিক্ষায়, আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে, নারীদের অবস্থা অনেকটা উন্নত পর্যায়ের বলে মনে হলেও পরিবারের চারদেওয়ালের অন্তরালে নারীরা আজও মধ্যযুগীয় সামাজিক বিধি দ্বারা পরিচালিত। তবুও বাঙালি মুসলিম পরিবারের উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত সব স্তরের নারীদের জীবনেই আত্মবিকাশের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় ধর্মীয়বিধিনিষেধের ‘ফতোয়া’।

আর যে কয়েকজন মুসলিম মেয়ে সামাজিক বিধিনিষেধের বেড়াজাল টপকে শিক্ষার আঙিনায় পা রেখেছে তাদের মানসিক বিকাশের স্তরও খুব একটা উন্নত পর্যায়ের নয়। শরিয়তি পর্দাপ্রথা বাঙালি মুসলিম নারীরা তেমন ভাবে মেনে না চললেও সামাজিক আভিজাত্য রক্ষার্থে অনেকেই অবরোধের গণ্ডি

থেকে মনকে পুরোপুরি মুক্ত করে তুলতে পারেনি। মুসলিম ব্যক্তিগত আইন এবং শরিয়তি বিধান এই দুইয়ের সূত্রে মুসলিম মৌলবাদী ধর্মগুরুদের মানবতার পরিপন্থী 'ফতোয়া' জারি করার চরিত্র উদঘাটিত হয়েছে বহুকাল ধরে। প্রাচীন কাল থেকেই সাহিত্যের শৈল্পিক দর্পণে ধরা পড়েছে মুসলমান নারীদের সামাজিক অবস্থানের চিত্র। বিংশ শতাব্দীর অন্তিম পর্যায়ে যখন বিশ্বজুড়ে নিজেদের অধিকার আদায়ের দাবিতে নারীরা সরব হয়েছে, সেই সময়ে দাঁড়িয়েও মুসলিম নারীরা অশিক্ষা, তালাক, বহুবিবাহের মতো সামাজিক প্রথার কবল থেকে মুক্ত হতে পারেনি। সেজন্য বাঙালি মুসলমান নারীদের সামাজিক অবস্থান কতটা প্রশ্ন চিহ্নের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে তা একটি পৃথক অনুসন্ধিৎসার কারণ হয়ে উঠেছে এই সময়ের কয়েকটি উপন্যাসের বিশেষত্বের দাবিতে।

এটি যদিও বহুবিস্তৃত একটি আলোচনার বিষয়, তা সত্ত্বেও আলোচনার সুবিধার্থে বিশ শতকের শেষ দুই দশকের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকদের উপন্যাসকে বেছে নিয়েছি। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের (১৯৩০-২০১২) 'অলীক মানুষ' (১৯৮৮), আবুল বাশারের (১৯৫১-) লেখা উপন্যাস 'ফুলবউ' (১

৯৮৮), 'ধর্মের গ্রহণ' (১৯৯২) এবং আফসার আহমেদ (১৯৫৯-২০১৮) রচিত 'আত্মপরিচয়' (১৯৯০), 'অন্তপুর' (১৯৯৩), 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিসসা' (১৯৯৫), 'দ্বিতীয় বিবি' (১৯৯৭)।

এই উপন্যাসগুলিতে মুসলিম সমাজের নারীদের অবস্থানকে তুলে ধরা হয়েছে উত্তর আধুনিকতার আলোকে। সাহিত্যের আঙিনায় ধরা থাকে সমাজ বিবর্তনের ধারা। সেজন্য আধুনিক সভ্যতায় পৌঁছেও মুসলিম সমাজের প্রাচীন ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ গুলির অভিঘাত মুসলিম নারীদের জীবনকে কতটা বিপর্যস্ত করে তোলে এই কথাসাহিত্য গুলির মাধ্যমে তা আলোচনা করাই এই গবেষণার মূল আলোচ্য বিষয়। অভিসন্দর্ভটিকে তিনটি পর্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়টি হল- 'ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপট ও বাঙালি মুসলমান সমাজ'। এখানে বাংলার নবজাগরণ পর্ব এবং তার পরবর্তী সময়ের বাঙালি মুসলমান সমাজের বিবর্তনের দিকগুলি আলোচনা করা হয়েছে। বাঙালি হিন্দু সমাজের সংস্কার আন্দোলনের পাশাপাশি মুসলিম সমাজের সংস্কার আন্দোলন বিষয়টিকে দেখানো হয়েছে।

এই সময় রামমোহন বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তিরা নারীদের জীবনে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে হিন্দু সমাজে প্রচলিত যাবতীয় কুসংস্কার থেকে নারীদের মুক্ত করে তোলার প্রয়াস চালিয়েছেন। ঠিক এই সময়ে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব হারিয়ে বাঙালি মুসলমান সমাজে শুরু হয়েছিল ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন। মুসলমান সমাজ থেকে 'অনৈসলামিক' রীতিনীতি দূর করে 'ইসলামিকরণ' করাই ছিল এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। এই আন্দোলনের সীমাবদ্ধতায় হিন্দু সমাজের তুলনায় মুসলিম সমাজের পিছিয়ে পড়ার যে ইতিহাস তৈরি হল তা বাঙালি মুসলমান সমাজ আজও বহন করে চলেছে। পরবর্তীকালে বেগম রোকেয়ার পথ অনুসরণ করে মুসলিম নারীদের মুক্তির প্রশ্নে মুসলিম সমাজ নিজেদের সামাজিক মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার চেষ্ঠা করেছিল। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এসে এই পিছিয়ে পড়া মুসলমান সমাজ নিজেদের সামাজিক মুলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে কতটা সক্ষম হয়েছিল সেই বিষয়গুলি এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় 'ইসলামি ব্যক্তিগত আইন ও বাঙালি মুসলিম নারী' তে রয়েছে ইসলামি ব্যক্তিগত আইন সংক্রান্ত আলোচনা। এখানে শুধুমাত্র মুসলিম নারীদের জন্য প্রণীত ইসলামি আইনগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যে আইনে মুসলিম নারীর সামাজিক অধিকারের প্রশ্ন সম্পৃক্ত রয়েছে। একটা সময়ের দাবিতে আরবের ক্রান্তিকালীন এক পঠভূমিতে ইসলামি আইন তৈরি হয়েছিল। প্রত্যেক ধর্মের আইনই তৈরি হয়েছিল সময়ের দাবিতে, আবার সময়ের দাবিকে সামনে রেখেই সেই আইনের পরিবর্তন হয়েছে। সেজন্য আরবের এক বিশেষ সময়ের দাবিতে তৈরি হওয়া তালাক, বহুবিবাহ, সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত আইনগুলি আজকের সময়ের দাবিতে ভীষণ গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ধর্মীয় অনুশাসনে আবদ্ধ হয়ে এই আইনগুলিই ভিন্ন পথে কখনও যথাযথ, কখনও বিকৃত প্রয়োগে বাঙালি মুসলিম নারীদের আজও আহত করে চলেছে। তাই বাংলা কথাসাহিত্যে মুসলিম নারীদের নিয়ে আলোচনার পূর্বে মুসলমান নারীদের জন্য রচিত ইসলামি আইন গুলির আলোচনা একান্ত জরুরি বলে অনুভব করেছি।

তৃতীয় অধ্যায় 'বিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকের কথাসাহিত্য ও মুসলিম নারী' তে আলোচিত হয়েছে এই সময়ে রচিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কথাসাহিত্যে মুসলিম সমাজের কয়েকটি দিকের কথা। অবরোধবাসিনী মুসলিম নারীদের জীবন যন্ত্রণার কথা, সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রশ্নে নারীদের নিরাপত্তাহীনতার অভাব, বহুবিবাহ জনিত সমস্যায় জর্জরিত নারীদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই, বিবাহ বিচ্ছেদ জনিত সমস্যায় ইসলামি শরিয়তি বিধানে পিষ্ট হয়ে যাওয়া নারীদের তীব্র মুক্তি কামনা প্রভৃতি সামাজিক সমস্যায় বিপর্যস্ত মুসলিম নারীদের জীবনের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে এই কথাসাহিত্য গুলিতে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, আবুল বাশার এবং আফসার আহমেদের মতো সমাজমনস্ক সাহিত্যিকরা মুসলিম সমাজের অশিক্ষিত দরিদ্র পরিবার থেকে শুরু করে শিক্ষিত উচ্চবিত্ত মুসলিম পরিবারের নারীদের কথা তুলে এনেছেন তাঁদের আখ্যানে। এই কথাসাহিত্য গুলির মাধ্যমে মুসলিম সমাজের ধর্মগুরুদের ধর্মীয় 'ফতোয়া' জারি করার চরিত্র কিভাবে উদঘাটিত হয়েছে এবং সেই 'ফতোয়া'র জালে তটস্থ মুসলিম নারীরা কতটা বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর প্রতিস্থাপন করতে পেরেছে এই বিষয় গুলিই তুলে ধরা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

প্রথম অধ্যায়

ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপট ও বাঙালি মুসলমান সমাজ

ঊনবিংশ শতাব্দী বাঙালির ইতিহাসে যুগসন্ধির কাল, বাংলার নবজাগরণের নতুন অধ্যায় সূচিত হয়েছিল এই সময়ে। একদিকে বাঙালির অতীত ঐতিহ্যের প্রতি অন্ধবিশ্বাস অন্যদিকে রক্ষণশীলতা থেকে মুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টা। এই দুইয়ের টানাপোড়নেই উনিশ শতকের বাঙালির নবজাগরণ শুরু হয়েছিল। বাংলায় ইংরেজদের আগমনের বহুপূর্বেই ভারতবর্ষ বিদেশীদের শাসনাধীনে ছিল। সাড়ে পাঁচশ বছর মুসলমান শাসনে দেশে মধ্যযুগীয় ভাবধারার বৈশিষ্ট্য বেশিরভাগই অপরিবর্তিত ছিল। ইংরেজরা বাংলার শাসনভার গ্রহণ করার সাথে সাথে বাংলার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক সর্বত্রই কমবেশি পরিবর্তন দেখা দিল। ইংরেজদের পৃষ্টপোষকতায় বাঙালি অভিজাতবর্গের চিন্তা চেতনায় নতুন ভাবনার উদয় হয়। পশ্চিমী সভ্যতার অভিঘাতে বাঙালির জীবনযাত্রা, শিক্ষা, জ্ঞান বিজ্ঞানচর্চা সবকিছু মিলে জন্ম হল নতুন যুক্তিবাদ, নতুন সংস্কৃতি। পাশ্চাত্য শিক্ষার অভিঘাতে বঙ্গদেশে কেবল নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছিল তা নয় ; বরং এ দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত অভিজাত বাঙালিদের মনোভাবই যথেষ্ট পরিমাণে পাল্টে গেল।

আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নতুন বাঙালি অভিজাত শ্রেণি নব্য যুক্তিবাদী চিন্তাভাবনায় পরিবারের মহিলাদের প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলেন। বিশেষ করে বিবাহ, দাম্পত্যজীবন এবং মহিলাদের সম্পর্কে এমন এক ধরনের নতুন চেতনার জন্ম হল যা বাঙালি পূর্বপুরুষ ইতিপুর্বে কোনওদিন অনুভব করেনি। এই সময়ে রামমোহন, বিদ্যাসাগর আবির্ভূত হলেন নারীদের জীবনে ত্রাতার ভূমিকায়। রামমোহন প্রথমেই নারীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নিবারণ করলেন সতীদাহ এর মতো ঘৃণ্য সামাজিকপ্রথা। বিদ্যাসাগর মহাশয় নারীর যন্ত্রণাকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করে লিখেছিলেন, "হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না।"[১] নারীদের এরকম পরিস্থিতিতে শুধু সতীদাহ নিবারণ করাই যথেষ্ট নয়। নারীকে শরীর মন সব দিক থেকে বাঁচানোর জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক ব্যাধি থেকে নারীদের মুক্ত করতে চাইলেন।

বিভিন্ন শাস্ত্র ঘেঁটে বাল্যবিধবাদের বিবাহের স্বপক্ষে যুক্তি খাঁড়া করে ১৮৫৬ সালে ইংরেজ সরকারের সাহায্যে বিধবাবিবাহ আইন পাশ করালেন। হুমায়ন আজাদ তাঁর 'নারী' গ্রন্থে লিখেছেন, "রামমোহন ও বিদ্যাসাগর যদি উনিশ শতকে ওই আইন পাশ না করাতেন, তাহলে বিশ শতকে গান্ধির ভারতবর্ষে ওই আইন কখনও প্রবর্তিত হতো না; কেননা বিধবা হতো দুষ্ট রাজনীতিকদের জন্য চমৎকার রাজনীতি।"[২] পুরুষ সমাজের নিজেদের স্বার্থে তৈরি করা কতকগুলি সামাজিক প্রথা নারীদের জীবনে যে অমবস্যার অন্ধকারে ঢেকে দিয়ে ছিল, এই দুজন মহাপুরুষ নারীদের অন্তঃপুরের আলোহীন পরিবেশ থেকে মুক্ত করে বাইরের মুক্ত খোলা হাওয়ার স্বাদ দিতে চাইলেন। ধীরে ধীরে নারীর জন্য উন্মুক্ত হল শিক্ষার দ্বার। আর তাতেই নারীর দীর্ঘদিনের মানসিক যন্ত্রণার ইতিহাস প্রকাশিত হল।

বাঙালি মেয়েদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন খ্রিস্টান মিশনারীরা। তাঁদের সাথে যোগদান করলেন নব্য শিক্ষিত বাঙালি সম্প্রদায়। এই সময় কেবল যে রামমোহন অথবা তাঁর প্রগতিশীল বন্ধুরা- দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬), প্রসন্নকুমার ঠাকুর (১৮০১-১৮৮৬), প্রমূখের মতো প্রগতিশীল লোকেরাই এবিষয়ে সচেতন ছিলেন তা নয়। রাধাকান্ত দেবের (১৭৮৪-১৮৬৭) মতো রক্ষণশীল মানুষও স্ত্রীশিক্ষার ভালো দিকগুলি উপলব্ধি করেছিলেন। এই সময়ে মেয়েদের লেখাপড়া সম্পর্কে নতুন সচেতনতার উন্মেষ ঘটাতে 'সমাচার দর্পণ', 'জ্ঞানাঙ্কুর' -এর মতো পত্র পত্রিকাগুলিও সোচ্চার হয়ে ওঠে। এক এক করে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় এসে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়াসকে অনেকটা উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যান। ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীও শাস্ত্রকে দূরে সরিয়ে মানবিক দিক থেকে নারীদের সমাজে স্বীকৃতি দিতে চাইলেন। তাঁরা উপলব্ধি করলেন, "নারীর মুক্তির মধ্যেই সমাজ জীবনের অগ্রগতি নিহিত আছে। নারীকে পিছনে ফেলে রাখলে নারী আমাদের পিছনে ঠেলে দেবে।"[৩] তাই তাঁরা নারীর সার্বিক উন্নতির কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

১৮৬০-এর দশকে শিক্ষিত সমাজের ক্ষুদ্র একাংশ মেয়েদের স্বাধীনতার প্রথম ধাপ হিসাবে অন্তঃপুরবাসিনীদের অবরোধ মুক্ত করতে চাইলেন। সমাজের এ অংশ অবশ্য দেশীয় খৃস্টান ও ব্রাহ্মদের। ব্রাহ্মধর্ম প্রভাবিত কিছু সদ্য শিক্ষিত হিন্দু যুবকও ছিল এদের মধ্যে। ১৮৫০ –এরা উপলব্ধি করতে সমর্থ হন যে, স্ত্রীশিক্ষা তথা মহিলাদের মানসিক বৃত্তির বিকাশে সবচেয়ে বড়ো বাধা হল অবরোধ প্রথা। তারা আরোও অনুভব করেন যে অবরোধের ফলে পুরুষ ও নারীর স্বাভাবিক সম্পর্ক বিঘ্নিত হয়। কালীপ্রসন্ন ঘোষ তাঁর 'নারীজাতিবিষয়ক' প্রস্তাব গ্রন্থটি প্রকাশ করেন ১৮৭৯ সালে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত মহিলা বিষয়ক গ্রন্থগুলির মধ্যে এটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কালীপ্রসন্ন এই গ্রন্থে বলেন- ''নারীজাতিকে অন্নজলে বঞ্চিত করিয়া মৃত্যু মুখে নিক্ষেপ করা যদি পাপ হয়, শিক্ষালাভে বঞ্চিত করিয়া তাঁহাদিগকে দুঃখ দূর্গতি এবং পাপমুখে নিক্ষেপ করা তাহা অপেক্ষাও ভয়ানক পাপ।. . . যদি শিক্ষালাভ নারীজাতির পক্ষে বাঞ্ছনীয় হয়, স্বাধীনতা যে তবে কেন বাঞ্ছিত হইবে না, আমরা তাহা কোনো মতেই অনুমান করতে পারি না। স্বাধীনতা বিরহে যথার্থ শিক্ষালাভ করা কখনই সম্ভবপর হয় না। . . .স্বাধীনতা, সমুদয় নরনারীর ঈশ্বরপ্রদত্ত স্বাভাবিক সম্পদ। মনুষ্য মনুষ্যের স্বাধীনতার দাতা, হন্তা নহে। . . ঈশ্বর যখন নরনারীকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন তখন পৃথিবী বিচূর্ণিত হইলেও নারীজাতির স্বাধীনতার পরিণামে অমঙ্গল হইবে না''।[৪]

গোড়ার দিকে অবরোধ মোচনকেই মেয়েদের স্বাধীনতা বলে গণ্য করা হত। যদিও অবরোধ মোচন করলেই একজন মহিলা স্বাধীনতা লাভ করেন না- স্বাধীনতা অবরোধ মোচনের তুলনায় অনেক ব্যাপক একটা ধারণা। কারণ এই সময়ে অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল মূলত উচ্চবর্ণের হিন্দু ও মুসলমান সমাজের আভিজাত্য রক্ষার্থে। এই সময়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলারা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা মেনে নিলেও তাদের সে শিক্ষার আদর্শ এবং উদ্দেশ্য দুটোই ছিল অন্যরকম। ব্যক্তি স্বাধীনতার চাহিদা তখনও এই সমস্ত নারীদের কাছে কাম্য বস্তুতে পরিণত হয়নি। বিংশ শতাব্দীর নারীমুক্তি আন্দোলনকারী আদর্শের সঙ্গে এই মহিলাদের আদর্শের সাদৃশ্য ছিল না। তাঁরা তখনও পুরুষ সমাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত -

ঐতিহ্যিক মূল্যবোধের প্রতি আস্থাবান ছিলেন। শিক্ষলাভ করে তাঁরা সেই ধরনের মহিলা হতে চাচ্ছিলেন শিক্ষিত ভদ্রলোকরা যাঁদের আদর্শ বলে গণ্য করেছিলেন। তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন পুরুষ প্রধান সমাজে শিক্ষালাভ করে 'আধুনিক' স্ত্রী এবং মাতা হওয়া ছাড়া তাদের আর কোনো বিকল্প নেই। তাঁরা আসলে অবরোধ মোচনকেই স্বাধীনতার সঙ্গে এক করে দেখেছিলেন। এই তথাকথিত 'স্বাধীনতা' বা 'স্ত্রী স্বাধীনতা', 'নারীমুক্তি' এই শব্দগুলির ধারণা বাঙালিদের মনে দাঁনা বাঁধে আরোও অনেক পরে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশীয় পূর্ণজাগরণকে রেনেইসান্স বলে আখ্যায়িত করা যাক অথবা না যাক এই জাগরণ ছিল সেকালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং এর ফলেই বঙ্গদেশে মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণা থেকে বেরিয়ে আসে। ঔপনিবেশিক শাসনের দ্বারা ইংল্যান্ড যদি বঙ্গদেশের কিংবদন্তি ধারণাসমূহ হরণ করে থাকে তবে তাঁর বদলে তাঁরা বঙ্গদেশকে দিয়েছিল উদার চিন্তাধারা ও শিক্ষা, এবং তাঁর হাত ধরেই বঙ্গদেশে আধুনিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়।

এইভাবে দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফলে সমাজে নারীশিক্ষার পথ উন্মেচিত হয়েছিল। বহু প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে একদিন যে পথ চলা নারী শুরু করেছিল, সময়ের হাত ধরে একের পর এক মহীয়সী নারীরা এসে সেই পথকে আরোও মসৃণ করে গেছেন। কৃষ্ণভাবিনী দেবী কুমুদিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবীরা শিক্ষাকে হাতিয়ার করে লেখার মাধ্যমে যুগে যুগে নারীর অন্তরের শক্তিকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করে গেছেন। তাঁরা অনুভব করেছিলেন, "আন্দোলনের মাধ্যমেই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, কান্না অথবা অনুনয় দিয়ে নয়।"[৫] যা পরবর্তীকালে নারীদের মধ্যে প্রসারিত হয়ে বৃহৎ আন্দোলনে নারীদের উদবুদ্ধ করে গেছে। কৃষ্ণভাবিনী দেবী দীর্ঘদিন ইংল্যাণ্ডে বসে সেখানকার নারী প্রগতির ধারা লক্ষ্য করেছিলেন। সেখানকার নারীরা তুমুল আন্দোলনের মাধ্যমে বিবাহিত নারীদের সম্পত্তিতে আধিকার এবং বিবাহ বিষয়ক আইনকে যথেষ্ট সংশোধন করতে পেরেছিলেন। ভোটাধিকার নিয়েও তাঁরা যে আন্দোলন শুরু করেছিল কয়েক দশকের মধ্যেই তা সফল হয়েছিল। তাই স্বদেশের নারীদের শোচনীয় দুর্দশা থেকে মুক্তির প্রশ্নে 'ইংল্যাণ্ডে বঙ্গমহিলা' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, "আজ যদি আমরা, যেমন ইংরেজ মহিলারা

পার্লামেন্টের সভ্য মনোনীত করিবার ক্ষমতা পাইবার জন্য অতিশয় চেষ্টা এবং গোলযোগ করিতেছে, সেইরূপ স্ত্রী স্বাধীনতার জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে আঘাত করিতে পারিতাম; আজ যদি আমরা অবলা ও নম্র নাম বিসর্জন দিয়া, অন্তরের বেগ গোপন না রাখিয়া, তাহাদের (পুরুষদের) সম্মুখে চিৎকার স্বরে কোলাহল করিতাম; তা হইলে হয়ত বঙ্গবাসীর কর্ণ আমাদের যন্ত্রণারবে আকৃষ্ট হইত।"[৬] তাঁর এই ভাবনাকে পাথেয় করে বিশ শতকে রাজনীতির নতুন ভাবনায় বাঙালি নারীকে আন্দোলনের অনুসারি করে তোলে। "১৯১৭ সালে সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে নারী প্রতিনিধির একটি দল নারীশিক্ষা, স্বাস্থ্য, উন্নত ব্যবস্থা ও ভোটাধিকার দাবির এক স্মারকলিপি পেশ করেন। ১৯২১ সালে ভোটাধিকার আদায়ের জন্য 'বঙ্গীয় নারী সমাজ' গঠিত হয়।"[৭] পাঁচ বছর টানা আন্দোলন করে ১৯২৬ সালে বাঙালি নারীরা প্রথম ভোটাধিকার লাভ করেন।

নারীরা ভোটের অধিকার পেলেও তা ছিল কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। পুরুষদের মতো মেয়েদের লোকসভাতে সমান অধিকার ছিল না। ১৯৭০ সালে 'Commitee of the Stastus of Women' এর প্রতিষ্ঠার পর থেকে সামাজিক সব ক্ষেত্রে নারীদের সমানাধিকার প্রদানের প্রচেষ্টা করা হয়। স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষের নারীদের জন্য বেশ কিছু আইন প্রচলন হয়েছিল। যেমন- ১৯৫৫ তে হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৬ তে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, দেহ নিয়ে অবৈধ কারবার আইন। ১৯৬১ তে মাতৃত্বকালীন সুবিধা আইন, সমানহারে বেতন প্রদান আইন চালু হয়েছিল ১৯৭৮ সালে। ১৯৯৯ তে ভ্রুন হত্যা নিবারণ আইন এবং ২০০৫ সালে পারিবারিক হিংসার ক্ষেত্রে মহিলা সুরক্ষা আইন। এইভাবে সময়ের হাত ধরে নারীরা ধীরে ধীরে অনেক আইনি অধিকার সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে।

লক্ষ্য করার বিষয় যে ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে যে সমস্ত নারীদের মুক্তির দাবি উঠেছিল তার বেশিরভাগ টাই হিন্দু সমাজের নারীদের কেন্দ্র করে। উনিশ শতকের বঙ্গদেশে রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীরা যে সমাজ সংস্কারের আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তার পরিধি ছিল সীমাবদ্ধ। সতীদাহপ্রথা নিবারণ থেকে শুরু করে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা অবধি যে সমস্ত সামাজিক

আন্দোলন হয়েছে তা মূলত কলকাতা কেন্দ্রিক। ফলত উনিশ শতকের সমাজসংস্কার আন্দোলনে গ্রামীণ নিম্নবিত্ত হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ভুমিকা নেই বললেই চলে। এর মূল কারণ অবশ্য নিহিত রয়েছে সমাজের একেবারে গভীরে। ভারতবর্ষে মানুষের শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম নিয়ন্ত্রিত হত তাদের কুলগত বৃত্তি দিয়ে। শতাব্দীর পর শতাব্দী এর কোনও পরিবর্তন হয়নি। বরং বর্ণাশ্রমকেও এর সঙ্গে জুড়ে দিয়ে এই ব্যবস্থা চিরস্থায়ী রূপ দেওয়া হয়েছিল। ইংরেজ রাজত্ব স্থাপন হওয়ার পর "দ্রুত গতিতে মুসলমানেরা দুরাবস্থায় পতিত হন। শাসনযন্ত্রে নিযুক্ত মুসলমান আমিন ফৌজদারেরা আধিকারচূত হন। মুসলমান সৈন্যদের পরিবর্তে সিপাহীরা নিযুক্ত হওয়ায় তারাও কর্মচ্যুত হন। বিচার বিভাগের মুসলমানদের ক্ষমতা লুপ্ত হয়। এই ভাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মুসলমানদের অধগতি হয়"।[৮] হিন্দু-মুসলমানেরা পাশাপাশি অবস্থানের ফলে হিন্দু উচ্চবিত্ত শ্রেণি খুব দ্রুত নিজেদের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নিলেও মুসলমানরা এত সহজে তা করতে পারেনি। কলকাতা কেন্দ্রিক মুসলিমসমাজ আধিকাংশই শ্রমজীবি শ্রেণির মানুষ থাকার ফলে তাঁদের আর্থিক অবস্থার খুব একটা উন্নতি এই সময়ে হয়নি। এর ফলে পরবর্তী অন্তত এক শতাব্দী ধরে উচ্চবর্ণের স্বল্পসংখ্যক হিন্দুই ইংরেজি শিক্ষায় এগিয়ে থাকলেন বিপুল সংখ্যক নিম্নবিত্ত হিন্দু ও মুসলমানদের তুলনায়। আবার শিক্ষায় এগিয়ে থাকার ফলে তাঁরাই গড়ে তুললেন তথাকথিত শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি। অপরপক্ষে, মুসলমান অথবা নিম্নবর্ণের হিন্দুরা তাদের কুলগত বৃত্তি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকলেন। এবং একবার পিছিয়ে পড়ার পর এই সমাজের মানুষেরা অসমান দৌড়ে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়তে থাকলেন। ফলে মুসলমান এবং নিম্নবিত্ত হিন্দুদের মধ্যে মহিলারা যে লেখাপড়ার দিকে অনেকটা দেরি করে এগিয়ে এলেন, তারও অন্যতম প্রধান কারন এটাই।

কিন্তু বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক বিরাট অংশে ছিল মুসলমান সমাজ। উনিশশতকে তাদের সমাজ সংস্কারের চেহারা কেমন ছিল সেটাও গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়। "বিশ শতকের ঊষালগ্ন পর্যন্ত সময়কাল ছিল বাংলার মুসলমানদের জন্য একটি গৌরবহীন অধ্যায়। অবক্ষয় ও অধঃপতনের কালোছায়া পড়েছিল জীবনের সর্বস্তরে। জন-মানস ছিল স্থবির ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন।

অমানবিক শাস্ত্রবিধি ও জঘন্য দেশাচারের যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত ছিল গোটা সমাজ জীবন। শাস্ত্রবিধিই দেশাচার-লোকাচারের ছদ্মবেশে সমাজকে নিয়ন্ত্রন করছিল।"[৯] বাঙালি মুসলমান সমাজের এরূপ শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ি ছিল সমাজ গঠনের প্রক্রিয়া। বঙ্গদেশে ব্রিটিশ শিক্ষা ও সংস্কৃতির চাপে বাংলার মুসলমান সমাজ নিজেদের পৃথক ভাবে সংগঠিত করতে শুরু করে। তাঁরা ব্রিটিশ ভারতকে 'দার-উল-হাব' অর্থাৎ শত্রুর দেশ বলে মনে করে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ধর্ম কর্মে আরোও মনোযোগী হয়ে ওঠে। তারা তরিকায়ে মহাম্মদীয়ার মাধ্যমে ধর্মীয় বিধান আচার-অনুষ্ঠানের উপর বেশি করে জোর দিতে শুরু করে। পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌল্লা ইংরেজদের কাছে রাজনৈতিক ক্ষমতা হারালে ফার্সি ভাষা গুরুত্ব হারায়। উপরন্তু ১৮৩৭ সালে ইংরেজি ভাষাকে আধুনিক শিক্ষার প্রধান মাধ্যম ঘোষণা করায় ফার্সি ভাষার স্থান দখল করে ইংরেজিভাষা। ফলে বাঙলার খানদানি অবাঙালি মুসলমান যাদের প্রধান ভাষা মূলত উর্দু ও ফার্সি, তারা ব্রিটিশ শাসনের শুরুতেই বাংলা ছেড়ে উত্তর ভারতে চলে গিয়েছিল।

তবে এই সময়ে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব হারিয়ে মুসলমান সমাজে নবজাগরণ ঘটেছিল অন্যভাবে। "১২০৩ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খলজি কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের পর থেকে এদেশে মুসলমান শাসনের গোড়াপত্তন হয়। তখন থেকে শুরু করে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিরাজদ্দৌলার পতন পর্যন্ত সাড়েপাঁচশ বছর প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে মুসলমান-সুলতান-সুবেদার-নবাব-নাজিম বাংলাদেশে রাজত্ব করে"।[১০] মুসলমান শাসন শুরু হওয়ার পূর্বেই আরব বনিকদের সাথে সূফি ধর্মপ্রচারকরা ভারতবর্ষে আগত হয়। ধীরে ধীরে তাঁরা গ্রামবাংলাসহ সারা ভারতবর্ষে সূফি ধর্মের মূল বার্তা প্রচার করতে শুরু করেন। "ইসলাম ধর্মে শরিয়ত এবং মারিফত নামে ধর্ম পালনের দুটি ধারা প্রচলিত আছে। হাদিস কোরান অনুযায়ী একেশ্বরে বিশ্বাস এবং তাঁর উপাসনা করার নাম শরিয়ত। এটি শুষ্ক জ্ঞানবাদের ধারা। মারিফত হল অধ্যাত্মমুখী সাধন ভজনের মত ও পথ।"[১১] বাংলার আবেগপ্রবণ হৃদয়ে ইরানীয় সূফিদের প্রভাব পড়েছিল সবথেকে বেশি। কারণ এইসময় মাতৃভাষায় রচিত ধর্ম-বিষয়ক গ্রন্থ না থাকায় নব্য ধর্মান্তরিত বাঙালি মুসলমানরা শরিয়তের অনুশাসন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারেনি।

এছাড়াও আচার-অনুষ্ঠানপ্রিয় বাঙালি মন ইসলামের অনাড়ম্বর সরল জীবনের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারেনি। ফলে, "ধর্মমত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সকলের মনের বদল হয়নি এবং পূর্বাকালের অনেক সংস্কার তাদের মধ্যে অক্ষুণ্ণ রয়ে গিয়েছিল।"[১২] মানুষের হৃদয় জয় করা মানবতাবাদী সূফিমত পথকে রক্ষণশীল মুসলিম হানাফি সম্প্রদায় গ্রহণ করতে পারেনি। তাই তারা পীর-গুরুদের প্রাধান্য বেড়ে যাওয়া বাংলাদেশে একসময় সুফিদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। মুসলমান সমাজ থেকে ইসলামের মূল শরিয়ত বিরুদ্ধ রীতিনীতি দূর করে 'ইসলামীকরণ' করাই ছিল এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য।

কেবলমাত্র কোরান ও হাদিসের নিয়ম অনুযায়ী ধর্ম পালন করার রীতি প্রচারের উদ্দেশ্যে আরবের আব্দুল ওহাব (১৭০৩-১৭৯২) অষ্টাদশ শতকে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তাঁর আন্দোলনের আদর্শ বহন করে ভারতবর্ষে ধর্মসংস্কারের আন্দোলন প্রথম শুরু করেছিলেন সৈয়দ আহমেদ(১৭৮৬-১৮৩১)। পরবর্তীকালে বঙ্গদেশে এই একই আন্দোলন শুরু করেন ফরিদপুরের হাজী শরীয়তুল্লা (১৭৬৪-১৮৪০) এবং তাঁর পুত্র দুদু মিয়া (১৮১৯-১৮৬২) এই দুটি আন্দোলন যথাক্রমে 'ওয়াহাবী' এবং 'ফারায়াজী' নামে পরিচিত। উনিশ শতকে এই আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। বাংলার রাজনৈতিক বিপর্যয়ের হাত ধরে বাঙালি মুসলমান সমাজ নিজেদের সীমাবদ্ধতার মধ্যেই বাঙালি হিন্দুদের সাথে ইংরেজদের যুগে প্রবেশ করে। আর বংলায় ইংরেজি শাসনের প্রভাবে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় বাঙালির অন্তর ও বাহিরে যে পরিবর্তন এসেছিল, তাতেই শুরু হয়ে গিয়েছিল বাঙালির আংশিক নবজাগরণ। কিন্তু এই পরিবর্তন বাঙালি হিন্দু সমাজকে যেভাবে প্রভাবিত করল, সেইভাবে বাঙালি মুসলমানদের করল না।

এই সময়টা ছিল মুসলিম সমাজের চূড়ান্ত পতনের কাল। হিন্দুসমাজে যেই সময় আধুনিক ধ্যানধারণা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তুলতে রামমোহন রায়ের মতো শক্তিশালী নেতা আবির্ভূত হয়ে গেছেন, ঠিক সেইসময়-ই বাঙালি মুসলমান সমাজ নেতৃত্বহীন, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। মুসলমান পরিবারের অর্থনৈতিক বিপর্যয় মোকাবিলা করার জন্য চাকরীর ক্ষেত্রে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রথম অনুভব করেছিলেন আব্দুল লতিফ।

"১৮৬৩ সালে 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' স্থাপন করে কলকাতার শরিফ মুসলমানদের চিন্তার জগতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেন।"[১৩]

তবে তিনি মক্তব-মাদ্রাসায় আরবি ফার্সি ভাষাকে বহাল রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে আরবি ফার্সি না জানলে শরিফ মুসলমান সমাজের মানুষের শ্রদ্ধা করা যায় না। তিনি মাতৃভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে আরবি ফার্সি ভাষা শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে ছিলেন সব থেকে বেশি। সমাজে নতুন বিপ্লব আনার কথা তখন অবধি তাঁরা কেউ ভাবেননি। মুসলিম মেয়েদের দুর্দশা দূর করার ও শিক্ষা দানের কথা সর্বপ্রথম বলেছিলেন তিনি। কিন্তু নারী শিক্ষার জন্য বাস্তব পরিকল্পনা করে উঠতে পারেননি। পরবর্তীকালে আমীর আলি, দেলওয়ার হোসেন, সৈয়দ সামসুল হুদা, প্রমুখরা কিন্তু নতুনভাবে শিক্ষা ও সমাজ আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহন করেন। মৃত পুরাতন আভিজাত্যের মোহ থেকে বেরিয়ে এসে "তাঁরাই প্রথম 'কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়ন'(১৮৯৩) এবং 'প্রাদেশিক বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা সমিতি'(১৯০৩) স্থাপন করে তাঁদের আন্দোলনকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।"[১৪] মাতৃভাষা বাংলা কে শিক্ষার মাধ্যম করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। গ্রামের মানুষকেও কলকাতার চৌহদ্দি পেরিয়ে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে প্রভাবিত করেছিলেন তাঁরা। যুক্তিবাদী দেলওয়ার হোসেন মুসলিম সমাজের অনগ্রসরতার জন্য ইসলামীয় রীতি-নীতিকেই মূলত দায়ি করলেন। তিনিই প্রথম মুসলিম বহুবিবাহ, সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন।

উনিশ শতকের বাংলার হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের সামাজিক বিবর্তনের প্রেক্ষাপট তুলনামূলকভাবে পর্যালোচনা করলে লক্ষ্য করা যায় যে, হিন্দু সমাজে রামমোহন, বিদ্যাসাগর-এর মতো নেতারা এসে হিন্দু সমাজের চিরন্তন কুসংস্কারাদি দূর করতে সমকালীন যুগের প্রয়োজনে এই সমাজকে পুনর্গঠন করার বিস্তর প্রয়াস করেছিলেন। হিন্দু সমাজের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষের সাথে শিক্ষা, সমাজ, সংস্কৃতি, প্রভৃতি বিষয়েরও উন্নয়ন এই আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিল। কিন্তু অন্যদিকে মুসলমান সমাজের অবস্থা ছিল অন্যরকম। মুসলমান নেতারা যারা অধিকাংশই ছিল নগরবাসী, তারা নিজেদের বহিরাগত মুসলমানদের বংশধর বলে গর্ব অনুভব করতেন।

এরা বেশিরভাগই পারিবারিক উর্দু ভাষায় কথা বলতেন এবং বাংলা ভাষাকে নিম্নশ্রেণীদের ভাষা বলে অবজ্ঞা করতেন। ফলে তাঁদের সাথে গ্রামীণ মুসলমানদের আত্মিক যোগাযোগ ছিল ভীষণ কম।

আব্দুল লতিফরা বাস্তব জীবনের কিছু সুযোগ সুবিধা লাভের জন্য ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেও পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ভাবধারার দ্বারা বাঙালি মুসলমানদের প্রভাবিত করতে পারেনি। শিক্ষিত হিন্দুদের মতো পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক শিক্ষা অর্জনের কোন আগ্রহ এদের মধ্যে দেখা যায়নি। যে অল্প সংখ্যক মুসলিম ইংরেজি শিক্ষায় এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের বৈষয়িক উন্নতি সাধন করা। তার ফলে মুসলিমমনন একদিকে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা ও অন্যদিকে রক্ষণশীল মুসলিম সমাজ মাদ্রাসাশিক্ষার মধ্যেই বিচরণ করাই তাঁদের চিন্তা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি দীর্ঘকাল বজায় ছিল। ফলে, "যখন অন্যান্য সম্প্রদায়ের নারী সমাজ শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রগতি সাধন করে নিজেদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে যাচ্ছিল তখন মুসলিম নারী সমাজ অশিক্ষা, নির্যাতন-মূলক অবরোধ প্রথা, বৈধব্য, বাল্যবিধবা, পণপ্রথা, তালাক প্রভৃতি সমস্যায় ডুবে ছিল। এঁদের অবস্থা কয়েদিদের চেয়ে মন্দ ছিল। অধিকার বঞ্চিত, অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম নারীরা মুক্ত আলো বাতাস থেকে বঞ্চিত হয়ে খাঁচার পাখির মতো ধুঁকে ধুঁকে মরছিল।"[১৫]

বাংলায় মুসলিম মহিলাদের অধিকার নিয়ে প্রথম স্পষ্ট ভাষায় কথা বলেছিলেন বেগম রোকেয়া। তিনি-ই প্রথম অনুভব করেছিলেন, "নারীর ন্যায্য অধিকার ইসলামে স্বীকৃত হয়েছে বলে মুসলমানরা যে দাবি করেন, অবাস্তব। কারণ, তত্ত্বত ইসলাম মেয়েদের শারীরিক হত্যা নিবারণ করলেও, মুসলমানরা অম্লান বদনে কন্যাদের মনন, মস্তিস্ক এবং বুদ্ধিবৃত্তি আজও অবাধে হত্যা করছেন। কন্যাকে জ্ঞানের আলোক থেকে বঞ্চিত করা এবং চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ রেখে বিবেককে পঙ্গু করা অনেক মুসলমান কেবল যে অন্যায় বলে মনে করেন না, তাই নয় বরং তাকেই গণ্য করেন আভিজাত্যের পরিচায়ক বলে।"[১৬] জায়া, জননী, নারীর এই প্রথাগত ভূমিকাকে রোকেয়া পরিবর্তন করতে চাইলেন তাঁর কর্মসূচীর মাধ্যমে।

ইতিপূর্বে কিছু নারীর এই দুই রূপকে স্বীকার করে নিয়ে সামান্য কিছু পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছিলেন কিছু সমাজ সংস্কারক। কিন্তু রোকেয়া যুগের মুসলিমদের সম্পাদিত পত্রপত্রিকায় নারীর ভুমিকা নিয়ে মহিলা ও পুরুষ প্রবন্ধকারদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নারী পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর বাইরে গিয়ে সমাজে কোন ভুমিকা পালন করতে পারবে কিনা এ নিয়ে সেই সময় রক্ষণশীল মুসলিম সমাজে পরস্পর বিরোধী মতবাদ সৃষ্টি হয়েছিল। "স্ত্রী শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী কেউই ছিলেন না। এমনকি রক্ষণশীল পুরুষ প্রাবন্ধিকরাও নন। তারা এই বিষয়টিকে একটি 'প্রয়োজনীয় পাপ কাজ' বলে গণ্য করতেন। এম এফ আব্দুল হাকিম বিক্রমপুরী সওগত-এ লিখেছিলেন- "এখন প্রশ্ন হইতে পারে, মেয়েদের জন্য আমরা কিরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারি। তদুত্তরে আমার বক্তব্য যে সাধারণ স্কুল কলেজ হইতে তাহাদের শিক্ষা প্রণালী বিভিন্ন হউক।. . .এককথায় আগেকার সুখ-শান্তি ফিরিয়া পাওয়া যায় এবং সর্বকার দুঃখদৈন্য ঘুচিয়া নিরানন্দ সংসারে আনন্দ ফিরিয়া আসে, সেরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে'।"[১৭] অর্থাৎ নারীকে গৃহনিপুণা করে তোলায় ছিল তখনকার নারীশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। শিক্ষিত আধুনিক নারী হয়ে সামাজিক ক্রিয়া কাণ্ডে অংশগ্রহণ করানোর কোন চিন্তা ভাবনা তাঁদের ছিল না।

বেগম রোকেয়ার নারী শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল বাংলার মুসলিম নারীদের শিক্ষা, স্বাধীনতা ও প্রকৃত অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। মুসলিম নারীদের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে, অবরোধ ভেঙে স্বনির্ভর করার কথায় তিনি আজীবন বলে গেছেন। বেগম রোকেয়ার লেখার মূল বিষয় ছিল নারী মুক্তি। তবে, "ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ, ঈশ্বর, অবতার প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি যে উক্তি করছেন তা অভিনব এবং এ যুগের মানুষের কাছেও বিস্ময়কর মনে হতে পারে।"[১৮] 'আমাদের অবনতি' শীর্ষক প্রবন্ধে রোকেয়া তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, "আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ গ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। .....যদি ঈশ্বর কোন দূত রমণী-শাসনের জন্য প্রেরণ করিতেন, তবে সে দূত বোধ হয় কেবল এশিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকিতেন না। দূতগণ ইউরোপে যান নাই কেন?...আরও দেখ, যেখানে ধর্মের বন্ধন অতিশয় দৃঢ়, সেইখানে নারীর প্রতি অত্যাচার অধিক।"[১৯]

রোকেয়ার এই সমস্ত কথা তখনকার মুসলিম সমাজে আলোড়ন তুলেছিল। রোকেয়ার নারীমুক্তির হাত ধরে মুসলিম সমাজের নারীদের মুক্তির প্রশ্নে, নারীকেন্দ্রিক নানা সমস্যা ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে অনেক পুরুষ লেখকও সমাজে প্রশ্ন তুলেছিল। অবরোধ প্রথার ফলে স্বাস্থ্য ও সমাজ উভয় দিক থেকে যে মুসলিম নারীরা দুর্বল হয়ে পড়ছে বেগম রোকেয়ার এই ভাবনার সাথে সহমত পোষণ করেছিলেন অনেক লেখক-লেখিকাগণ। বেগম সামসুন্নাহার মাহমুদ অবরোধ প্রথাকে ইসলাম বিরোধী বলে আখ্যায়িত করেছেন, "কোঠর অথচ অনৈসলামিক অবরোধ প্রথার বিষময় ফলে আমরা যে শুধু অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছি এমন নহে, সঙ্গে সঙ্গে অতুল স্বাস্থ্য সম্পদ হইতেও বঞ্চিত হচ্ছি। ...অহেতুক ও অন্যায় অবরোধ ইসলাম কখনো অনুমোদন করে না।"[২০]

এই ভাবে বেগম রোকেয়ার নারীমুক্তির হাত ধরে মুসলিম সমাজের নারীদের মুক্তির প্রশ্নে এক এক করে নারীরা এগিয়ে এসেছিল। তাঁর হাত ধরেই সমাজে নারী জাগরণ ব্যপক আকার ধারণ করে। নারীকে কেবল শিক্ষার মাধ্যমে স্বাধীন এবং অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলায় নয়, তিনি চেয়েছিলেন তাদের অর্থনৈতিকদিক থেকেও স্বনির্ভর করে তুলতে। তাই নারীর মনে চেতনার বিকাশ ঘটাতে তিনি কলম ধরেছিলেন। মুসলিম নারীদের জীবনের যন্ত্রণাকে রোকেয়া নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন বলে ইসলাম ধর্মকে যারা অচলায়তনে পুরে বিকল করে রেখেছিল সেই অচলায়তনকে ভেঙে নবযুগের নবীন সূর্য উদয় করতে চেয়েছিলেন। বহু কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রোকেয়া তাঁর আন্দোলনকে চালিয়ে গেছেন। তাঁর সেই চলার পথকে স্তব্ধ করে দেওয়ার মতো যুক্তি সমাজপতিদের ছিল না বলেই, সমাজে শত প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করেও নারী মুক্তির জন্য সারাজীবন সমাজের কাছে বার্তা দিয়ে গেছেন।

রোকেয়ার সময়ের আর এক উদারপন্থী মুসলিম নারী হলেন মিসেস এম রহমান(১৮৮৫-১৯২৬)। ধর্মের দোহাই দিয়ে নারী জাতির বঞ্চনার বিরুদ্ধে তিনি লেখনি চালিয়েছিলেন। 'বাড়বানল'(১৯২২) প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "কোরআন, কোরআন শরীফ, কালামে মজিদ, আমার রাক্ষসী ক্ষুধার আহার কোরআন, আমার কারবালা প্রান্তরের প্রাণঘাতী তৃষ্ণার সুশীতল পানীয় কোরআন, তোমায় আজও বুঝতে পারিনি।

তোমায় বুঝতে চাই, তোমায় জানতে চাই, তোমায় আমি খেয়ে ফেলতে চাই।"[২১] মুসলিম নারীদের পর্দার অন্তরালের নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হওয়ার আহ্বান দিয়ে গেছেন তাঁর 'পর্দা বনাম বঞ্চনা প্রবন্ধে। তাঁর সময়ের মুসলিম পিতারা মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া বলতে 'আমার মেয়ে খতম কোরআন' এই শব্দটি বলে নিজেদের গর্বিত করত। কিন্তু মেয়ে 'খতম কোরআন' করে কোরানের একটি আরবি শব্দের অর্থও সারাজীবন ধরে উদ্ধার করতে পারেনি। মিসেস রহমান মুসলিম সমাজের নারীদের শিক্ষা, বিবাহপ্রথা, বহুবিবাহ, পর্দার অন্তরালে নারীদের রেখে অসম অন্যায়ের প্রশ্নে তখনকার মুসলিম সমাজের পুরুষদের তুলোধুনো করে গেছেন। মুসলিম নারীদের মুক্তির প্রশ্নে তিনি ধর্মীয় বিধানের পরিবর্তনের দাবি করে গেছেন মুসলিম পুরুষ সমাজের কাছে। এই দাবির প্রশ্নে তিনি কোরআন এর নির্দেশকেই মুসলিম সমাজের কাছে তুলে ধরে বলেছেন, "যে পযর্ন্ত্য কোন জাতি তাহাদের পরিবর্ত্তন না করে সে পর্যন্ত আল্লাহ তাহাদের কোন পরিবর্ত্তন করেন না। (কোরআন, সুরহবাদ)"[২২]

রোকেয়ার পরবর্তীকালে তাঁর নারী জাগরণকে পরবর্তী মুসলিম নারীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্রত নিয়ে আরও অনেক নারী এগিয়ে এলেন। আখতার মহল সৈয়দা খাতুন(১৯০১-১৯২৮), রাজিয়া খাতুন চৌধুরানী(১৯০৭-১৯৩৪), ছোটগল্পকার এম ফতেমা খানম(১৮৯৪-১৯৫৭), এরা প্রত্যেকেই মুসলিম নারীদের মনের খোরাক স্বরূপ শিক্ষার কথাই জোর দিয়ে বলেছেন। তাঁদের সমাজ ভাবনা ও চেতনার পরিচয় লিপিবদ্ধ করে গেছেন কম বেশি সাহিত্যের মাধ্যমে। নারী স্বাধীনতার প্রসঙ্গে রাজিয়া খাতুন বলেছেন-

> "শরিয়তে যতটা পর্দা আছে, তাহা অব্যাহত রাখিয়া আমরা স্বাধীনতা চাই। স্বাধীনতা অর্থ রাস্তায় নাচিয়া বেড়ানো নয়, আমরা চাই প্রকৃত মুক্তি, যা মনকে উন্নত, মহান,পবিত্র, স্নিগ্ধ ও দৃঢ় করে; নিজের ধর্ম ও সত্যের সহিত পরিচিত করে; অন্তর্জগত ও বহির্জগতের বিভিন্ন তথ্য আমাদের মনোগোচর করিয়া দেয়।"[২৩]

মুসলিম সমাজে মূলত ইসলামকে কেন্দ্র করে গৃহস্থলির শিক্ষার মধ্যেই মুসলিম নারীরা সীমাবদ্ধ ছিলেন। সেই 'মুসলিম নারীর মুক্তি' কামনা করে কোলকাতার বেথুন কলেজের প্রথম মুসলিম ছাত্রী ফজিলতুন্নেসা (১৯২৩) কলম ধরেছিলেন। "তাই বিংশ শতাব্দীর ঝড়ো হাওয়া বহু-কাল সুপ্ত মুসলিম নারীর প্রাণেও বেশ একটু কম্পন জাগিয়ে তুলেছে। তা'রা একটা প্রকাণ্ড ধাক্কা খেয়ে বাইরের দিকে ও জগতের অন্যান্য নারীর দিকে চেয়ে দেখছে; এবং তা'দের তুলনায় নিজেদের শারীরিক মানসিক ও নৈতিক অধঃপতন দেখে বিশেষভাবে লজ্জিত হ'য়ে পড়েছে। নারীত্ব ভুলে গিয়ে, নিজের আমিত্ব ভুলে গিয়ে, শুধু ভোগ্য বস্তু হয়ে থাকা নারী আর সহ্য করবে না।"[২৪] মুসলিম নারীর মুক্তির প্রয়াসে উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি বিদেশ পাড়ি দিয়েছিলেন। বিংশ শতাব্দীর একজন মুসলিম নারী নিজের জীবনকে গড়ে তোলার জন্য সেকালের মুসলিমসমাজের বিস্তর বিতর্ককে উপেক্ষা করে নিজের জীবন দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মুসলিম নারীদের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

রোকেয়ার পরবর্তীকালের মুসলিম নারীরা শুধুমাত্র সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজ কল্যাণে এগিয়ে আসেনি, তারা গৃহের অন্তরাল ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে সমসাময়িক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিল। আইন অমান্য আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন, প্রত্যেকটি আন্দোলনের সাথে বাঙালি মুসলিম নারীদের যোগসূত্র ছিল। নিম্নশ্রেণির চাষি ঘরের মুসলিম মেয়েরাও তেভাগা সহ অন্যান্য আন্দোলনে ভূমিকা পালন করেছিল। রোকেয়া ও তাঁর পরবর্তী যে সকল নারীরা শিক্ষার দ্বারা নারী মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন এই সমস্ত নারীরা তা কিছুটা হলেও বাস্তবায়িত করেছিল। যদিও বাংলার মুসলিম জনসংখ্যার তুলনায় সে সংখ্যাটা ভীষণ কম। তবুও পরিবারের গণ্ডি পেরিয়ে বাইরের জগৎ সংসারেও যে তারা সমান তালে ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম তার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন নিজেদের কর্মের দ্বারা।

এইভাবে উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের অনেকটা পরের দিকে হলেও মুসলিম সমাজ কে কিছুটা প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু মুসলিম নারী সমাজের এই নবজাগ্রত চেতনা, যুক্তিবাদী মানসিকতা এবং শিক্ষাকে পাথেয় করে এগিয়ে চলার গতি অনেকটাই থামিয়ে দিল দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

> "১৯৪০-এর পরবর্তী মন্বন্তর-দেশভাগ হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের দ্বন্দ্ব-দাঙ্গা বাঙালি সমাজের স্থিতিশীল ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। তারই ফলশ্রুতিতে সমসময়য়ের বাঙালি মুসলিম মেয়েদের প্রগতি-চেতনা, কর্মস্পৃহা খানিকটা দমে গিয়েছিল।"[২৫]

কারণ, "নারী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশ ছিলেন সমাজের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারভুক্ত, অনেকেই ছিলেন জমিদার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ মুসলিম নারী সম্প্রদায় নারী আন্দোলনের ধারা থেকে দূরে অবস্থান করেছিল।"[২৬]

এমনিতেই বেগম রোকেয়াদের মুসলিম নারী মুক্তির প্রয়াস ছিল খুবই সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। বেগম রোকেয়া কিংবা ফজিলতুন্নেসা ও অন্যান্যদের মুসলিম নারী মুক্তির প্রয়াস বাংলার বৃহত্তর মুসলিম সমাজকে খুব একটা আধুনিক করে তুলতে পারেনি। উপরন্তু দেশভাগের কারণে অধিকাংশ অভিজাত ও উচ্চবিত্ত বাঙালি মুসলিম পরিবারগুলি ওপার বাংলায় চলে গিয়েছিল। যারা এপার বাংলায় পড়েছিল তারা বেশিরভাগই নিম্নমধ্যবিত্ত ও দরিদ্র মুসলিম পরিবার। যার ফলে শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণির মুসলিম নারীরা ওপার বাংলায় গিয়ে নিজেদের চলার পথকে আরও মসৃন থেকে মসৃনতর করে তুলেছে। শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-সঙ্গীত ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে নিজেদের এপার বাংলার মুসলিম নারীদের তুলনায় অনেক উন্নত করে তুলেছে। পুথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আর্থিক স্বাধীনতা গড়ে তুলেছে।

অন্যদিকে অশিক্ষা, আর ধর্মীয় গোঁড়ামি এপার বাংলার মুসলিম নারীদের ধর্মীয় বিধানের আগলে বদ্ধ করে রেখে দিয়েছে। ইসলামে মুসলিম নারীদের অধিকার কতটা সে সম্পর্কে অসচেতনতার কারণে ধর্মীয় বিধান কর্তাদের 'ফতোয়ার' জালে তারা জর্জরিত। অশিক্ষার কুফলতায় তালাক, বহুবিবাহের মতো প্রথাগুলি মুসলিম নারীদের জীবনে মহামারির আকার ধারণ করেছে।

১৯৫৫ সালে হিন্দু বিবাহ আইন এবং ১৯৫৬ সালে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন প্রয়োগ করে ভারতবর্ষের হিন্দু নারীদের অনেকটাই অধিকার প্রদান করা হয়েছে। আর মুসলমানদের চলতে হচ্ছে এখনও ১৯৩৭ সালে প্রবর্তিত শরিয়ত আইন দ্বারা। ফলে তালাক প্রথার গলা ধাক্কায় তারা বিপর্যস্ত, মুসলিম নারীদের হাতে আজও বহুবিবাহকে নিয়ন্ত্রন করার মতো আইনি অধিকার এসে পৌঁছায়নি। সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রেও মুসলিম নারীরা অসম বিধানের স্বীকার। ভারতবর্ষের রক্ষণশীল মুসলিম মৌলবাদীদের তোষণ করতে গিয়ে, "গণতান্ত্রিক কাঠামো থাকা সত্ত্বেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আইনগুলির দিকে একটা নজর দেওয়া হয়নি। সেখানে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবটি বিশেষ প্রকট। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রক্ষণশীল অংশকে তোষণ করে যে শাসক গোষ্ঠী মেয়েদের অধিকার কতখানি খর্ব করতে পারে, তার উদাহরণ হলো, শাহবানু মামলার রায়ের উপর আইনী হস্তক্ষেপ।"[২৭] ১৯৮৫ সালে শাহবানু মামলা থেকে শুরু করে গুড়িয়া, ইমরানা, জ্যোৎস্নারা, লতিফুন্নেসা অবধি মুসলিম নারীদের তালাকের মামলায় গোটা দেশ জুড়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। তালাক প্রাপ্তা মুসলিম নারীদের অস্তিত্বের সঙ্কটের প্রশ্ন না তুলে মুসলিম রক্ষণশীল ধর্মকর্তারা শরিয়তি আইনের শুদ্ধতা রক্ষায় দেশ জুড়ে তুমুল বিতর্ক শুরু করে। আর তৎকালীন ভারত সরকার বৃহৎ অঙ্কের রক্ষণশীল মুসলিম ভোটবাক্সকে তাঁবে আনার জন্য গুটিকতক প্রগতিশীল মুসলিম ব্যক্তিদের শরিয়তি আইন পরিবর্তনের দাবিকে স্বাগত জানাতে পারেনি। শরিয়তের শুদ্ধতা রক্ষার জন্য 'মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড' গঠন করে হাজার হাজার মুসলিম নারীর অনাগত ভবিষ্যৎকে ধর্মীয় বিধানের মোড়কে বন্ধ করে রাস্তায় ছুড়ে দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু তা সত্ত্বেও বাঙালি মুসলমান সমাজের প্রগতিশীল এক অংশ দীর্ঘদিন লড়াই করে আসছে মুসলিম সমাজে নারী পুরুষদের মধ্যে অসম অধিকারের বিরুদ্ধে। বহুবিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, সম্পত্তির অধিকার প্রসঙ্গে মুসলিম নারীদের বঞ্চনার প্রশ্নে ধর্মীয় 'ফতোয়া'কে একপেশে পুরুষতন্ত্রের বিধান বলে অভিহিত করেছেন। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, আবুল বাশার, এবং আফসার আহমেদের মতো সমাজমনস্ক লেখক গোষ্ঠী এই সময়ে মুসলিম নারীদের দূরাবস্থা তুলে ধরতে লেখনিকে হাতিয়ার করেছেন।

মুসলিম নারীদের চরম বিপর্যয়কে সমাজের সামনে তুলে ধরতে নিম্নবিত্ত মুসলিম পরিবার থেকে শুরু করে অভিজাত শিক্ষিত মুসলিম পরিবারের চিত্রকে গভীর থেকে তুলে এনেছেন আখ্যানে। মুসলিম নারীদের অমর্যাদা, বহুবিবাহ, তালাক, পর্দাপ্রথা, নারীদের শিক্ষায় অবহেলা, প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের কামনায় লেখনি চালিয়েছেন শরিয়তি বিধানের বিরুদ্ধে। তালাক প্রথার বিরুদ্ধে ধর্মীয় বিধানকে আক্রমণ করে দৈনিক প্রতিবেদনের একটি লেখায় আফসার আহমেদ বলেছেন, "আসলে তাঁরা ধর্মের এই বিধিকে ঘৃন্য স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগান। তাঁরাই একটার পর একটা বিয়ে করেন, আর তালাক দিয়ে ছেড়ে দেন। সমাজের চোখে তাঁরা অপরাধী, ধর্ম তাঁদের অপরাধী সাব্যস্ত করতে পারেন না।"[২৮] মুসলমান সমাজে ধর্মরক্ষার ভার গ্রহণ করে বসে আছেন যারা, গ্রামীণ স্বল্পশিক্ষিত মুসলমান সমাজকে তাঁরা নিজেদের মতো করে ধর্মীয় বিধানের চাবুক দ্বারা শাসন করে চলেছে। ফলত ইসলামি আইনে সব থেকে বেশি বলি হয়ে চলেছে মুসলিম নারীরা। মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের মধ্যে মুসলিম নারীর অধিকার কতটা সম্মানজনক সে বিষয়ে আলোচনা করব পরের অধ্যায়ে।

তথ্যনির্দেশ

১। ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদবিষয়ক প্রস্তাব দ্বিতীয় পুস্তক'* (বিদ্যাসাগর রচনাবলী, তীর্থপদ দত্ত সম্পাদিত), তুলি কলম, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৭, পৃষ্ঠা- ৮৩৯

২। হুমায়ূন আজাদ, *'নারী',* আগামী প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ, বাংলাদেশ, ২০০০, পৃষ্ঠা- ২৭৪

৩। অমর দত্ত, *'ডিরোজিও ও ডিরোজিয়ানস',* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা- ১৮৮

৪। গোলাম মুরশিদ, *'নারী প্রগতি: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী',* নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০১৪, পৃষ্ঠা- ৫৬

৫। গোলাম মুরশিদ, *'রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া : নারী প্রগতির একশো বছর',* অবসর প্রকাশনা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩, পৃষ্ঠা- ১১৩

৬। কৃষ্ণভাবিনী দাস, *'ইংল্যান্ডে বঙ্গমহিলা',* (গোলাম মুরশিদ: 'রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া : নারী প্রগতির একশো বছর'), পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১১৩-১১৪

৭। সামসুন নাহার, *'বাংলা উপন্যাসে মুসলিম নারী',* আভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা- ১৯

৮। অমলেন্দু দে, *'বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ',* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পরিষদ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯১, পৃষ্ঠা- ১০৬

৯। ইমরান হোসেন, *'বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী : চিন্তা ও কর্ম',* বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩, পৃষ্ঠা- ৬৬

১০। ওয়াকিল আহমেদ, *'উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা'*(দ্বিতীয় খণ্ড), বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা- ১

১১। ওয়াকিল আহমেদ, *'উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা'*(দ্বিতীয় খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৬

১২। আনিসুজ্জামান, *'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*(১৭৫৭-১৯২৮), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৮৩, পৃষ্ঠা- ১৬

১৩। ওয়াকিল আহমেদ, *'উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা'*(দ্বিতীয় খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৫

১৪। আফরোজা খাতুন, *'বাংলা কথাসাহিত্যে মুসলিম অন্তপুর',* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১১, পৃষ্ঠা- ২১

১৫। ইমরান হোসেন, *'বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী : চিন্তা ও কর্ম',* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৯৬

১৬। গোলাম মুরশিদ, *'রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া : নারী প্রগতির একশো বছর',* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৮৮

১৭। শাহীন আখতার ও মৌসুমী ভৌমিক(সম্পাদিত): *'জানানা মহফিল',* স্ত্রী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ১৪-১৫

১৮। খোন্দকার সিরাজুল হক, *'মুসলিম সাহিত্য ও সমাজ',* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা-৭৭

১৯। মিসেস আর এস হোসেন, *'আমাদের অবনতি',* নবনূর, ভাদ্র, ১৩৩১ (শাহীন আখতার ও মৌসুমী ভৌমিক(সম্পাদিত); জানানা মহফিল) পৃষ্ঠা- ১৯

২০। ইমরান হোসেন, *'বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী : চিন্তা ও কর্ম',* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১০১

২১। তেজস্বিনী মিসেস এম. রহমান, *'বাড়বানল',* বিজলী , চৈত্র ১৩২৯, (শাহীন আখতার ও মৌসুমী ভৌমিক(সম্পাদিত); *'জানানা মহফিল'*) পৃষ্ঠা- ৫২

২২। তেজস্বিনী মিসেস এম রহমান, *'আমাদের স্বরূপ',* ধুমকেতু, আশ্বিন ১৩২৯, (শাহীন আখতার ও মৌসুমী ভৌমিক(সম্পাদিত); *'জানানা মহফিল'*) পৃষ্ঠা- -৫৯

২৩। রাজিয়া খাতুন চৌধুরানী, *'সমাজ ও গৃহে নারীর স্থান',* সওগাত, ভাদ্র ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ (শাহীন আখতার ও মৌসুমী ভৌমিক(সম্পাদিত); *'জানানা মহফিল'*)

২৪। ফজিলতুন্নেসা, *'মুসলিম নারীর মুক্তি',* সওগাত, ভাদ্র ১৩৩৬, (শাহীন আখতার ও মৌসুমী ভৌমিক সম্পাদিত); *'জানানা মহফিল'*)

২৫। সুনন্দা মল্লিক, *'মুসলিম নারী প্রগতির প্রেক্ষিতে মুসলিম মানসের অন্বেষণ'*(বাংলা কথাসাহিত্যে মুসলিম মানস), দীপন প্রকাশনা, কলকাতা, ২০১০, পৃষ্ঠা- ৮৫

২৬। আনোয়ার হোসেন, *'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী,* প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মে ২০০৬, পৃষ্ঠা- ২২০

২৭। যশোধরা বাগচী ও অনিন্দিতা ভাদুরী(সম্পাদিত): *'মেয়েদের চোখে আইন আইনের চোখে মেয়েরা',* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও মানবীবিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০১, পৃষ্ঠা- ১৩

২৮। আফসার আহমমেদ, *'মুসলমান সমাজ: নানাদিক',* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা- ৬০

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামি আইনের প্রেক্ষাপট ও বাঙালি মুসলিম নারী

সপ্তম শতাব্দীতে আরবের মক্কা শহরে ইসলাম ধর্মের উত্থান ও বিকাশ ঘটিয়েছিলেন হজরত মহম্মদ। প্রাক-ইসলাম পর্বে আরব ভূমি ছিল অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। এই সময় আরবের রাজনৈতিক, সামাজিক, অবস্থান ছিল অতীব শোচনীয় ও নৈরাশ্যজনক। "সাধারণত প্রাক-ইসলামিক যুগকে বলা হয় আইয়ামে জাহেলিয়া অর্থাৎ অন্ধকার যুগ বা কুসংস্কারের যুগ। সেই যুগে যাযাবর প্রকৃতি পুরোপুরি পরিত্যাগ করতে পারেনি আরববাসীগণ। বহু গোত্র উপগোত্রে গঠিত আরববাসীদের সংঘাত লেগেই থাকত। সংঘাতের সময় আচরণকে নিয়ন্ত্রন করার কোনো প্রশাসনিক ব্যবস্থাও ছিল না। প্রত্যেক গোষ্ঠী নিজস্ব প্রথা ও রীতিনীতির দ্বারা পরিচালিত হত। হজরত মহম্মদের সময় আরবদের প্রশাসনের জন্য কোনো স্থায়ী সরকার বা প্রশাসন ছিল না। প্রত্যেক গোষ্ঠী নিজেদের সর্দারের আদেশ মেনে চলত। কোনো পরিবার সর্দারের আদেশ অমান্য করলে, তাকে অন্য গোত্রে যোগ দিয়ে আত্মরক্ষা করতে হত।"[১]

এই সময়ে হজরত মহম্মদ ছিলেন তাঁর সময়ের থেকে অনেকখানি এগিয়ে থাকা একজন সমাজ সংস্কারক। তিনি ২৩ বছরের ব্যবধানে ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্তরে বেশ কিছু পরিবর্তন নিয়ে এসেছিলেন। ধর্ম প্রচারের ঊষা লগ্ন থেকে তিনি ইসলাম ধর্মীয় আইন প্রবর্তন করেছিলেন। এই আইন সমগ্র আরববাসীর ব্যক্তি জীবনের জন্য এবং সামাজিক অবস্থার জন্য, সর্বপরি আরবের রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্য প্রযোজ্য। আরববাসীর মানসিকতা, চরিত্র এবং তাদের সামাজিক ইতিহাসের ছাপ পড়েছে এই আইনের উপর।

সপ্তম শতাব্দীতে আরবে ইসলামের আবির্ভাবের সময় যে প্রথা ও রীতিনীতি প্রচলিত ছিল, ইসলামী আইন রচনার মূল ভিত্তিও ছিল সেই প্রথা ও রীতিনীতি কেন্দ্রিক। "সেকালে কাবা গৃহে শুধু যে প্রার্থনা বা উপাসনা হইত তাহা নহে, উহা অন্য বহুবিধ সামাজিক এবং রাজনৈতিক উৎসবের কেন্দ্র ছিল। মক্কার দ্বাদশ পরিবারের মধ্যে সকল সরকারী পদ নিবদ্ধ ছিল।"[২]

এখানে ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের সাথে সাথে বিভিন্ন সামাজিক অপরাধ মূলক কর্মকাণ্ডের বিচার ব্যবস্থা চলত খুব সহজ ভাবে। স্বাভাবিকভাবেই বিচার ব্যবস্থার প্রয়োজনে নতুন নতুন আইন প্রণয়ন অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। এই আইন গুলিই পরবর্তীকালে ইসলামি আইন রূপে গৃহীত হয়। সময় যত এগিয়েছে, ইসলামের আইন বিষয়ক বক্তব্য গুলি আইনব্যবস্থার সমস্ত শাখাতে ছড়িয়ে পড়েছে– ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্ষেত্রে। ইসলামি আইন যেসব ক্ষেত্রে মতামত ও অবদান রেখেছে সেগুলি হল –"হাকুক-উল-ইল-ইবাদ (মানবাধিকার), সিয়াসা সারিয়া (প্রশাসন), কাজা (বিচার ব্যবস্থা), মুয়ামলাত (transactions), জিনায়াত (ফৌজদারি আইন) এবং আওয়াল-অল-শাকসিয়া (ব্যক্তিগত আইন)।"[৩] মহম্মদের সময়ে এই আইনগুলির বেশির ভাগ টাই গৃহীত হয়েছিল কোরানে। পরবর্তীকালে এই সমস্ত আইনগুলিই ইসলামের প্রসারের সাথে সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামি আইনের মূল উৎস গুলি হল - কোরান, হাদিস, কিয়াস, ইজমা। এর মধ্যে প্রথম ও প্রধান উৎস হল 'কোরান'। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা এটিকে আল্লাহর ঐশী বাণী বলে মনে করেন। হজরত মহম্মদের সময় দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে এই বাণী গুলি কোরানে সম্পৃক্ত হয়। আরবি ভাষায় কোরানের ১১৪ টি সুরা (অধ্যায়) তে সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যা, এবং তার সমাধান সম্পর্কে মতামত রয়েছে। ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষরা পারিবারিক সম্পর্ক, উত্তরাধিকার, বিবাহ বিচ্ছেদ, এবং অনান্য সামাজিক ক্ষেত্রে কোরানের এই বাণী বা পরামর্শ গুলিকে প্রাধান্য দেয় সব থেকে বেশি।

ইসলামি আইনের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হল 'হাদিস'। হজরত মহম্মদ তাঁর ব্যবহারিক জীবনে যা বলেছেন বা করেছেন তাই হল হাদিস। এগুলি তাঁর অনুগামীরা মুখস্ত রাখতো বংশ পরম্পরায়। পরবর্তীকালে এগুলিকে ইসলাম আইন তত্ত্ববিদ ও পণ্ডিতেরা বই আকারে গ্রন্থবদ্ধ করেন। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা মহম্মদের ব্যবহারিক জীবনের করণীয় বিষয় গুলিকে 'সুন্নত' (পবিত্র) বলে মেনে চলার চেষ্টা করে চলে আজও। ৬টি হাদিস সংগ্রহ খুবই উল্লেখযোগ্য- "১। বুখারী ২। মুসলিম ৩। আবু দাউদ ৪। ইবন-ই-মাজা ৫। তিরমিজি ৬। নাসায়ী। একসঙ্গে এই হাদিসগুলোকে বলা হয় 'সিয়াসত্ত্বা'। (প্রামানিক ছয়)"[৪] ইসলামি আইনের তৃতীয় উৎস হল 'ইজমা'। 'ইজমা' শব্দটির অর্থ–একত্রীকরণ।

মহম্মদের অনুগামীরা কোনো বিষয়ে একমতে উপনীত হলে সেটাকেই প্রামাণিক আইন বলে গ্রহণ করা হত। পরবর্তীকালে তাঁদের স্বীকৃত এই আইনগুলিই ইসলামি আইন হিসাবে গ্রহণ করা হয়। যখন কোনো সমস্যার সমাধান কোরান বা হাদিসে পাওয়া না যায়, তখন 'ইজমা'র সাহায্যে সমাধান খোঁজার চেষ্টা করা হয়। ইসলামি আইন তত্ত্ববিদ আবু হানিফা বলেন–"যে কোনো কালে পূর্বতন ইজমার অনুরূপ কোনো সমস্যার উদ্ভব হইলে পরবর্তী যুগেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে"[৫]

ইসলামি আইনের চতুর্থ উৎস হল কিয়াস। 'কিয়াস' এর অর্থ হল– অনুমান করা। কোরান বা হাদিস বা অন্য কোনোভাবে যখন সমস্যার সমাধান পাওয়া যাচ্ছে না তখন জ্ঞান, বিবেক, বিচার, বুদ্ধির উপর নির্ভর করে সমাধান বের করার কথা বলা হয়েছে এই মতে। অর্থাৎ পরিবর্তনশীল জগতে বাস্তবতার প্রয়োজনে ইসলামি আইনের মূল সুত্রকে মিলিয়ে নেওয়া। এই আইন তত্ত্বের প্রনেতা আবু হানিফা, তাঁর প্রচেষ্টায় 'কিয়াস' গৃহীত হয় মুসলিম আইন তত্ত্বের সবচেয়ে গ্রহণ যোগ্য উৎস রুপে। আবু হানিফার মতে–"কিয়াস হল আইনের বিস্তৃতি। মূল আইন যখন সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে বলতে পারে না, তখন মূল আইন হতে ইল্লাতের মাধ্যমে নতুন বিধি আহরণ করতে হয়, এখানে আইনের যে বিস্তৃতি হয় ইহা হল কিয়াস।"[৬]

একসময় আরবভূমির অন্ধকার কাটাতে মহম্মদ যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, ইসলাম প্রসার তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যে মনোভাব এবং পদ্ধতি মহম্মদ অবলম্বন করেছিলেন সেই বিবর্তনের ধারা বহন করেছে ইসলামি আইন। এক কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের অনিষ্টকর কাজগুলিকে নিষিদ্ধ করে, সেই রীতির উপর দাঁড়িয়েই ইসলামি আইন বিস্তৃতি লাভ করেছিল। সময়ের সাথে সাথে ইসলামি আইনের প্রায়গিক দিকটি দুরকম ভাবে প্রচলিত হতে শুরু করে- ভৌগলিক এবং ব্যক্তিগতভাবে। প্রথমটি একটি নির্দিষ্ট এলাকায় প্রযোজ্য হবে, আর দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যক্তিগত আইন প্রয়োগ হবে একটি নির্দিষ্ট ধর্মাবলম্বী জনগোষ্টীর উপর। যেমন– মুসলিম ব্যক্তিগত আইন কেবল মুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য, আর হিন্দু আইন কেবল হিন্দুদের জন্য প্রযোজ্য।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে মুসলিমরা বাস করে, সব জায়গায় মুসলিমদের ব্যক্তিগত আইন দ্বারা চালিত নয়। প্রত্যেক দেশের ভৌগলিক সীমানার মধ্যে নির্দিষ্ট আইন আছে, সেই দেশের মুসলিম সহ প্রত্যেক ধর্মীয় গোষ্ঠীর মানুষ সেই আইনের আওতায় পড়ে। কিন্তু যে সমস্ত দেশের মুসলিমরা অপ্রধান সেখানে বেশিরভাগ জায়গাতেই মুসলিম ব্যক্তিগত আইন কার্যকরী রয়েছে। ইসলামি আইন কার্যকরী করার আবার কতকগুলি পদ্ধতি রয়েছে। যেমন– ফরজ (অবশ্যই পালনীয় কর্তব্য), হারাম (যা কোনো মুসলিম করতে পারবে না), ওয়াজিব (পালন করতে হয়), মকরুহ (পালন করতে না করা হয়), জায়েজ (কোনো বিষয়, যা সম্পর্কে ইসলামের কোনো নির্দেশ নেই)। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে ইসলামি আইন ব্যক্তিগত জীবনে কার্যকর হয়ে থাকে। বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, নারী পুরুষের সম্পর্ক এসবের ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যক্তিগত আইনের একটি নিদির্ষ্ট বক্তব্য আছে। ভারতবর্ষের মুসলিমরা একদিকে ভৌগলিক আইনের মধ্যে আছে, আবার মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের মধ্যেও আছে। সুতরাং ভারতবর্ষে ইসলামি ব্যক্তিগত আইনের সীমাবদ্ধতা বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে,– মুসলিম বিবাহ আইন, মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইন। বাকি সব ক্ষেত্রে ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী যে আইন প্রচলিত ভারতীয় মুসলিমদের ক্ষেত্রেও তা সমান ভাবে প্রযোজ্য। ভারতবর্ষে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন হিসাবে যে আইনগুলি এখনও অবধি প্রচলিত রয়েছে তাতে প্রায় সিংহভাগ জুড়েই সম্পৃক্ত থেকে গেছে মুসলিম নারীদের সামাজিক অধিকারের প্রশ্ন। সে কারণে এই আইনগুলি নিয়ে আলোচনা একান্ত জরুরি।

মুসলিম বিবাহ আইন :

ইসলামি মূল্যবোধে বিবাহ একটি ধর্মীয় এবং সামাজিক চুক্তি। এই চুক্তির দ্বারা স্বামী-স্ত্রী তাঁদের জৈবিক, মানবিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক প্রশান্তি লাভ করবে। উভয়ের ক্ষেত্রে বিবাহকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, এবং সন্তানদের বিবাহ দেওয়ার বিষয়ে অভিভাবকদের সচেষ্ট হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইসলামে 'গৌরীদান' এর মত কোনো নিদির্ষ্ট বিধান না থাকলেও বাল্যবিবাহের প্রচলন প্রথম থেকেই ছিল। যদিও ইসলামি আইনে দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে পূর্ণতাপ্রাপ্ত যুবক-যুবতীর বিবাহকে শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি বলে ধরা হয়েছে। কিন্তু এখনও মুসলিম সমাজে কম বয়সে বিবাহ চালু আছে, এটা অবশ্য শিক্ষাগত অসচেতনতার কারনে। ইসলামে অন্তবির্বাহ (জ্ঞাতি ও কুটুম্ব) এবং বহির্বিবাহ (অনাত্মীয়) উভয় প্রথা অনুমোদিত ও প্রচলিত। বরপণ (dowry) অথবা কন্যাপণ (bride panie) কোনো টাই অনুমোদিত নয়। তবে সামর্থ্য থাকলে পরস্পর উপহার বিনিময়ের ক্ষেত্রে কোনো কঠোর বিধিনিষেধ নেই। আরবে ইসলাম আগমনের পর থেকে বিশুদ্ধ বিবাহ নীতির প্রয়োগে গোত্র ভিত্তিক সমাজের পরিবর্তে জন্ম নেয় পরিবারের। ইসলামি আইনে বিবাহের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল 'দেনমোহর'। বিবাহ অনুষ্টানের সময় ভাবী স্বামী তার ভাবী স্ত্রী কে একটি নিদির্ষ্ট অঙ্কের অর্থ দেবার অঙ্গিকার করবে। সেটাই হল দেনমোহর। "প্রাক ইসলামিক যুগে নারীর অভিভাবক মোহরানার দাবীদার হয়ে বিবাহ সম্পন্ন করত। ইসলামি আইনে মোহরানার দাবিদার হল পাত্রী।"[৭] বিয়ের সময়েই এই মোহর পরিশোধ করা যেতে পারে অথবা পরেও দেওয়া যেতে পারে। স্ত্রীর ভবিষ্যত আর্থিক নিরাপত্তার কথা ভেবে এটা করা হয়। যদিও ইসলামি আইনে সর্বনিম্ন মোহর হিসাবে যা ধার্য করা হয় তাতে একটি নারীর সারাজীবনের আর্থিক নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। আমাদের দেশে এখনও সর্বনিম্ন ৭৮৬ টাকা বা ৫০১ টাকা মোহরের বিনিময়ে বিবাহ হয়। বিবাহের পূর্বে পাত্র –পাত্রী উভয়ের সম্মতি নিয়েই বিবাহ সম্পন্ন হয়। ইসলাম পূর্ব যুগে অবশ্য মেয়েদের সম্মতির নেওয়ার কোনো বিষয় ছিল না। আরবে ইসলাম প্রথম মেয়েদের সম্মতির বিষয় টিকে গুরুত্ব দিয়েছে। এটা অবশ্যই প্রগতিশীলতার একটা নিদর্শন, মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠা তো বটেই।

তবে মোহর বিনিময়ের মাধ্যমে বিবাহের ফলে স্বামী কিছুটা অধিক ক্ষমতার অধিকারী হয় বলে মনে করছেন অনেক আইনতত্ত্ববিদ। কোরানের একটি আয়াতে বিষয়টি স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে–

> "আল্লাহ তায়ালা এতদুভয়ের একজনকে যে অপরের উপরে মর্যাদাশীল করিয়াছেন তাহার ভিত্তিতে পুরুষ নারীর উপরে প্রভুত্বশীল। এ কারনেও যে, পুরুষ মোহর ও ভরণ-পোষণের জন্য তাঁর অর্থ ব্যয় করে।" (সুরা নিসা, ৩৪ নং আয়াত)[৮]

ইসলামে বিধবা বিবাহ ও তালাক প্রাপ্তা নারীর বিবাহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুসলমান সমাজে এরূপ বিবাহের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হয়নি। তবে বিধবা বিবাহ বিপত্নীক পুরুষের সাথে হওয়াটা অধিক বাঞ্ছনীয় বলে মনে করা হয়েছে। বিধবা বিবাহের একটা কারণ ছিল তৎকালীন আরব দুনিয়ার সামাজিক পরিস্থিতি। যুদ্ধ বিগ্রহে পুরুষের প্রান হারালে তার বিধবা পত্নীর আর্থিক এবং সামাজিক স্বীকৃতি প্রদান করা। কোরানের সুরা 'বখারা'র ২৩৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাদের স্ত্রীরা চার মাস দশদিন অপেক্ষা করবে। যখন তার ইদ্দত (চার মাস দশ দিন) সময় পূর্ণ করবে তখন তারা নিজেদের জন্য বিধিমত কাজ (বিবাহ) করলে কোনো পাপ হবে না"[৯] অর্থাৎ এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে নারীর দ্বিতীয় বিবাহ সমাজে অস্মমানের কিছু নয়। কেবল তারা যেন গোপনে অসম্মান জনক কিছু না করে, সামাজিক ভাবে সম্মানের সাথে নারী নতুন জীবন শুরু করতে পারে।

ইসলামে বহুবিবাহের বিষয়টি একটি বিতর্কিত প্রশ্ন। সমগ্র বিষয়টি কুৎসিত প্রচারের পর্যায়ে চলে গিয়েছে। কোরানে একাধিক বিবাহের ঢালাও অনুমতি নেই। মহম্মদের সময় আরবের সামাজিক পরিস্থিতি অনুযায়ী বহু বিবাহের অনুমতি ধার্য হয়েছিল।

তাছাড়া তখনকার সামাজিক পরিস্থিতি অনুযায়ী এমন কিছু বিষয় ছিল যেগুলি গ্রহণ করা ছিল ভীষণ জরুরি। সে কারণে ইসলাম–পূর্ব যুগের অবাধ বিবাহের স্থলে, ইসলাম শর্ত সাপেক্ষে চার জন অবধি স্ত্রী রাখার অনুমতি দিয়েছে। তবে এক্ষেত্রে কোরানে উল্লিখিত বিশেষ শর্তটি ভীষন ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কোরানে বলা হয়েছে–"নারীদের মধ্য হতে তোমাদের পছন্দমতো দুটো, তিনটে, চারটে বিয়ে করো।

কিন্তু যদি আশঙ্কা করো যে, স্ত্রীদের মধ্যে সমান ব্যবহার ও ন্যায়বিচার করতে পারবে না, তাহলে একটি মাত্র বিয়ে করো।"[১০] (সুরা নিসা, ৩নং আয়াত) এবং এটা অবশ্যই পূর্ব স্ত্রীদের অনুমতি নিয়ে করতে হবে। এই শর্ত তে স্পষ্ট যে ইসলাম এক বিবাহের সমর্থন করে বেশি। সমান ব্যবহার করতে না পারলে একের অধিক বিবাহের অধিকার নেই। কোরানে আরও স্পষ্ট করে ঘোষণা করা হয়েছে –"তোমরা যতই ইচ্ছা করো না, কেন, তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে পারবে না। তবে তোমরা কোন একজনের প্রতি সম্পূর্ণ ঝুঁকে পড়ো না, এবং অপর কে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখো না, যদি তোমরা নিজেদের সংশোধন করো ও সংযমী হও তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।" (সুরা নিসা, ১২৯ নং আয়াত)[১১]

আসলে তৎকালীন আরবীয় সমাজ ব্যবস্থার কারণে ইসলামে একাধিক বিবাহের অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল যেমন– ১। যে সমস্ত বিধবাদের সন্তান আছে কিন্তু তাদের পালন করার মতো কেউ নেই, সেই সন্তানদের পালন করার জন্য ওই বিধবা রমণীকে সামাজিক মর্যাদা দান করা। ২। সমাজের অনাথ মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা স্থাপনের জন্য বিবাহ করা। ৩। যুদ্ধ বন্দিনীদের দাসী রূপে বা রক্ষিতা হিসাবে না রেখে তাদের স্ত্রী রূপে সামাজিক স্বীকৃতি দান করা। এগুলি সব গুলিই তখনকার আরবীয় সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে ধার্য করা হয়েছিল। যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে পুরুষদের সংখ্যা কমে গিয়েছিল। ফলে নারীদের সামাজিক কোন মর্যাদা ছিল না। তারা পুরুষদের ভোগ বিলাসের বস্তু হিসাবে বিবেচিত হত এবং বাজারের পণ্যদ্রব্যের মতো বিক্রি হত। সে কারণে বহুবিবাহের অনুমোদন ইসলামিক আইনে তৎকালীন আরবীয় সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে উপযুক্ত শর্ত সাপেক্ষে ধার্য হয়েছিল।

মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন

মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন এর ক্ষেত্রে সব চেয়ে বিতর্কিত শব্দটি হল 'তালাক'। 'তালাক' শব্দের অর্থ হল –বিচ্ছেদ। "পায়ের বন্ধন খুলে ফেলা। আত তালাক বা ঈয়া সিন ইকালিহি–সে উটের পায়ের বাঁধন খুলে দিল। তাল্লাকাল–মার'আ- সে স্ত্রীকে বিবাহের বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিল।"[১২]

বিবাহ বন্ধনের ক্ষেত্রে তালাক হল একটি অস্বাস্থ্যকর সামাজিক বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। তালাক ইসলামি ব্যক্তিগত আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

প্রাচীন কাল থেকে আরব দেশে ইসলাম প্রচার হওয়ার পূর্ব থেকেই স্ত্রীদের প্রতি তালাক অত্যাচার রুপে প্রচলিত ছিল। যে কোনো অবস্থায় যখন তখন পুরুষরা নারীদের তালাক দিতে পারত। পুরুষদের এই অধিকারের কোনো সীমা পরিসীমা ছিল না। কোনো নিয়ম কানুন ছাড়াই আবার যখন তখন তারা নিজেরাই তালাক ফিরিয়ে নিয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন নির্বাহ করতে পারত। এই সময় তালাক নিয়ে নারীদের কোনো অধিকার ছিল না। ইসলামি আইনে স্বামী যেমন বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার অধিকার রাখে ঠিক একই ভাবে "বিবাহের সময় চুক্তিমূলে স্ত্রীও এই অধিকার লাভ করিতে পারেন।"[১৩]

ইসলামীয় ধারণা অনুযায়ী বিবাহ একটি সামাজিক চুক্তি। সেই কারনে বিবাহের চুক্তি গুলি চালিয়ে নেওয়ার মূল কারন গুলি যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন সেটা খন্ডন করাই শ্রেয়। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে ইসলামে বিবাহের কোনো সম্মান নেই। বরং ইসলাম বিবাহিত জীবনে পারস্পরিক সহযোগিতা, বোঝাপড়া কে অনেক বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কোরানে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কে বলা হয়েছে "তারা তোমাদের আবরণ এবং তোমরা তাদের আবরণ" (সুরা বাকারা- ১৮৭)।[১৪] অর্থাৎ দাম্পত্য সম্পর্কে পরস্পর অন্তর এবং আত্মার সাথে যুক্ত থাকবে। হজরত মহম্মদ এই পারস্পরিক সম্পর্কের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন "নারী পুরুষের অঙ্গ।"(আবু দাউদ : ২৩৬)।[১৫] স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক এই সহানুভূতির দিকটি যখন থাকে না, তখন সামান্য বিষয়ে পরস্পরের প্রতি ঘৃণার পর্বত তৈরি করে। ফলে সর্বদা কলহ বিবাদ উভয়ের জীবনের গতিকে পিছনের দিকে ঠেলে দেয়। এরূপ সমস্যার ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ যদি পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করে নেয় তাহলে তা অতি উত্তম। কেননা কোরানে তালাকের কথা বলা হয়েছে ঠিকই কিন্তু তা সামান্য কথার উপর ভিত্তি করে এবং রাগে দেওয়ার মতো কোনো বিষয় নয়। যেভাবে ইসলামি আইনে বিবাহের সময় দুটি বাক্য বলে দুজন মানুষ পরস্পরের এতটা নিকটবর্তী হয়ে যায়, ঠিক একই ভাবে এই একটি বাক্য সেই বলিষ্ঠ সম্পর্ককে নষ্ট করে দেয়।

সেজন্য ইসলামি আইনে এই শব্দটির প্রয়োগ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাই এই বিষয়ে সকল মুসলিমদের সচেতন ও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। হজরত মহম্মদ বলেছেন- "আল্লাহ তা'আলার নিকট বৈধ জিনিসের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্য ও অপচ্ছন্দনীয় হচ্ছে তালাক"। (আবু দাউদ; ২১৭৪)[১৬] কোনো বৈধ কাজ এর থেকে খারাপ নয়। তালাক খারাপ এই জন্য যে এর প্রভাব শুধু দুই জন ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এর প্রভাবে একটি পরিবারের ঐক্য নষ্ট হয়ে যায়। নবপ্রজন্মের ভিত নষ্ট হয়ে যায়, ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ সমাজে ভাঙ্গন দেখা দেয়। এতো গভীর প্রভাবের জন্যই তালাক সবচেয়ে নিকৃষ্ট একটি শব্দ।

এখন প্রশ্ন হল তালাক তাহলে কেন ইসলামি আইনে বৈধতা লাভ করলো? এই প্রশ্নের ব্যাখ্যাও কোরানে দেওয়া আছে। বিবাহের উদ্দেশ্য উত্তম উপায়ে জীবন নির্বাহ করা। যখন তা আর সম্ভব না থাকে, এবং মতভেদ দূরীকরণ ও পরামর্শ জ্ঞাপনের যাবতীয় স্তর অতিক্রম করার পরেও দেখা যায় উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের বন্ধন দৃঢ় করার আর কোনোও উপায় নেই তখন বিচ্ছেদ ঘটানোয় উপযুক্ত সিদ্ধান্ত। এমন পর্যায়ে বিবাহবিচ্ছেদকে কোরান সঠিক বলেছে। "কুরআন বলছে যখন স্বামী- স্ত্রী উভয়ের মনে হবে যে তারা আর সুখময় জীবন অতিবাহিত করতে পারবে না, পরস্পরের অধিকার দিতে পারবে না এবং দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত বিধানসমূহ বাস্তবায়িত করতে পারবে না তখন তাদের বিচ্ছিন্ন হওয়াই বাঞ্ছনীয়"।[১৭] এমত অবস্থায় যখন বিবাহ বিচ্ছেদের কথা ভাবা হবে তখন সব দিক থেকে আলোচনা করতে হবে, পরিবারের বয়োজ্যষ্টদের ও অন্যান্য শুভাকাঙ্ক্ষীদের অবগত করতে হবে। তারপর ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী তালাক সংক্রান্ত নির্দেশনা নিতে হবে। কোরানের সুরা বাকারার ২২৯ নং আয়াতে বলা আছে–"অতঃপর যদি তোমরা (উভয় পক্ষের শালিসগণ) আশঙ্কা করো যে উভয়পক্ষ আল্লাহর আইনসমূহ ঠিক রাখতে পারবে না, তাহলে উভয়ের প্রতি কোন গুনাহ নেই যদি কোন কিছুর বিনিময়ে স্ত্রী নিজেকে মুক্ত করতে চায়। এগুলো আল্লাহর আইন, কাজেই তোমরা এগুলোকে লঙ্ঘন করো না।"[১৮]

এ পর্যায়ে এসে তালাকের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং তার জন্য কতকগুলি নিয়ম আছে, যেমন–

১। স্বামী যদি বিবাহের সময় স্ত্রীকে মোহর না দিয়ে থাকে তাহলে তালাকের পূর্বে স্ত্রীকে তা দিয়ে দিতে হবে এবং স্ত্রীর খোরপোষের বিষয়টি ধার্য করতে হবে।

২। মহিলাটি যদি এই সময় গর্ভবতী থাকেন তাহলে তালাক গ্রাহ্য হবে না। এরকম পরিস্থিতিতে উভয়পক্ষের বিচারকগণের বিবেচ্য হবে উভয়ের মধ্যে সমস্ত দন্ধ মিটিয়ে দিয়ে নতুনপ্রজন্মের কথা বিবেচনা করে তাদেরকে নতুন জীবনের স্বাদ দেওয়ার। কেননা কোরানে বলা হয়েছে –"যদি কোনো নারী তার স্বামীর কাছ থেকে খারাপ ব্যবহারের ভয় করে কিংবা বিচ্ছেদের, তাহলে তারা যদি নিজেদের মধ্যে শান্তির কোনো চুক্তি সম্পাদন করে তবে তাতে তাদের কোনো পাপ হবে না। শান্তিই উত্তম"। (সুরা: নিসা, আয়াত-১২৮)[১৯] আর যদি ওই মহিলা গর্ভবতী না হয়ে থাকেন সে ক্ষেত্রে –"তালাক প্রাপ্তা নারীরা তিন ঋতুকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে (তারা গর্ভবতী আছে কিনা তা জানার জন্য)...ইতিমধ্যে তারা যদি পুনরায় মিলিত হতে চায়, তাহলে তাদের স্বামীদের অধিকার আছে আছে তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার। আর তাদেরও (দ্বিতীয়বার তালাক প্রাপ্ত নারীদের) একই অধিকার আছে তাদের পক্ষে...ন্যায়সঙ্গতভাবে।"[২০] (সুরা: বাকারা, আয়াত -২২৮)

এই পর্যায় গুলি অতিক্রম করার পর তালাক বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। সেক্ষেত্রে বিচারকদের সামনে একবার মুখে বলে বা লিখিত উপায়ে জানিয়ে দিলেই হবে যে 'আমি তালাক দিচ্ছি'। তবে তালাক প্রদানের সিদ্ধান্ত শুধু মাত্র পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ইসলামি আইনে এবিষয়ে নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কিছু ক্ষেত্র উল্লেখ করা আছে। যেমন –

১। 'সমর্পিত তালাক'– এই পদ্ধতির মাধ্যমে বিচ্ছেদের সুযোগ নারীকে দেওয়া হয়েছে। এতে পুরুষ তালাকের আপন অধিকার স্ত্রীকে সমর্পণ করে দেয়। সুতরাং বিবাহের সময় অথবা বিবাহের পর যদি স্বামী তার স্ত্রীকে তালাকের অধিকার দিয়ে দেয় তাহলে সেটা হবে সমর্পিত তালাক। এক্ষেত্রে স্বামী যদি তার স্ত্রীকে কোনও শর্ত দিয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে ওই নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করে তবেই স্ত্রী তার অধিকার প্রয়োগ করে নিজে নিজেই তালাক নিতে পারবে।

২। 'খোলআ'- কোনও নারী যদি মনে করে সে বিবাহিত জীবনের অধিকার ও দায়িত্ব পালন করতে একান্ত অপারগ সেক্ষেত্রে সে তার স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছেদ চাইতে পারে। এক্ষেত্রে–"নারী মোহর ফিরিয়ে দেবে, অথবা যে পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে, ততটা ফেরত দেবে। সেই অর্থের বিনিময়ে পুরুষ তাকে তালাক দিয়ে দেবে।"[২১] এই পদ্ধতির নাম 'খোলআ' বা খুলা।

৩। 'ফাসখ'- ইসলামি আইনে বিচ্ছেদের এই পদ্ধতিটি সম্পন্ন হয় ইসলামি আদালত বা কাজীর দ্বারা। পুরুষের বিরুদ্ধে নারীর অভিযোগ রয়েছে যে তার স্বামী ব্যয়ভার চালাতে পারে না বা যদি কোনও মহিলার স্বামী হারিয়ে যায় অথবা স্বামী পাগল, সেক্ষেত্রে ওই মহিলা কাজীর কাছে বিষয়টি ব্যক্ত করবেন। কাজী বিষয়টি বিবেচনা করবেন। যদি তার অভিযোগ গ্রহন যোগ্য বলে বিবেচিত হয় তখন তিনি বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে দেবেন।

এখন প্রশ্ন হল কোরানে যদি তালাক সম্পর্কে এরকম বিধান দেওয়া থাকে তাহলে সমস্যা টা কোথায়? কেনই বা তালাক নিয়ে আমাদের দেশে এতো বিভ্রান্তি? একটা পচে যাওয়া, অস্বাস্থ্যকর দাম্পত্য জীবন থেকে মুক্তিলাভ করে নতুন করে বাঁচার অধিকার তো সকল নর নারীর কাম্য। আসল সমস্যাটা ইসলামিক আইনে নয়, বরং ইসলামিক আইনকে হাতিয়ার করে একদল স্বার্থন্বেষি ধর্মান্ধ ধর্মগুরুদের ইচ্ছামত ধর্মীয় ফতোয়া জারি করার মধ্যে এই সমস্যা লুকিয়ে আছে। "ইসলামের প্রথম যুগে আরবের নব্য প্রতিষ্ঠিত আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় ফতোয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পালন করলেও আজ প্রায় দেড় হাজার বছর পরে এই শব্দটি অত্যাচার ও ত্রাসের প্রতিভূ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফতোয়া আজ যারা চর্চা করে তাদের হাতে ধর্মের কল্যাণকর রূপটি বিকৃত হয়ে তা একটি কদর্য ও অসুভ নির্যাতনের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।"[২২] আমাদের দেশের মুসলিম নারীরা আজও বিভিন্নভাবে ধর্মীয় ফতোয়ার জালে জর্জরিত। ইসলামিক আইনের অপপ্রয়োগ শত শত মুসলিম নারীকে অসহায় করেছে। মৌখিক তাৎক্ষণিক তিন তালাকের কোনও উল্লেখ কোরানে না থাকা সত্ত্বেও, এই অস্ত্রটিই কত নারীর জীবনকে বিভীষিকাময় করেছে। আজ অবধি ইসলামিক আইনকে ব্যবহার করে মুসলিম সমাজে নারীদের

প্রতি যত অবিচার হয়েছে তার মধ্যে তালাক নিয়ে অরাজকতা হয়েছে সব থেকে বেশি। আমাদের দেশে কত হাজার হাজার মহিলা চোখের জল ফেলে গেছে এই একতরফা তালাকের কারনে। কোরানে তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে নারীদের অধিকার কিংবা সম্মতির কথা বলা হলেও তা লিখিত আকারেই থেকে গেছে। আমাদের দেশে সে অধিকার নারীরা কোনও দিনই প্রয়োগ করতে পারেনি। বিনা কারনে তাদের স্বামীরা তালাক দিয়েছে। শুধু কন্যা সন্তান হচ্ছে, পণের টাকা দেয়নি বলে, অন্য নারীতে আসক্ত, বাবা মায়ের পছন্দ হয়নি, এমন সব সামান্য কারণে তালাক প্রাপ্ত হয়েছে যুগের পর যুগ ধরে নারীরা। 'তালাক' নামের এই অস্ত্রটি পুরুষরা নিজেদের ইচ্ছাঅনুযায়ী প্রয়োগ করেছে। চিঠির মাধ্যমে, ফোন করে, এমনকি ইদানিং কালে মোবাইল ফোনে শুধু মাত্র মেসেজ করেও তালাক দেওয়া হচ্ছে। এরূপ পরিস্থিতিতে 'তালাক' মানে মুসলিম নারীর চোখের সামনে দুনিয়া কেঁপে ওঠা ছাড়া আর কিছু নয়। আবার কোনও কারণে রাগের মাথায় কিংবা মাতাল অবস্থাতেও পুরুষ যদি 'তালাক' শব্দটি তিনবারে উচ্চারণ করে, তার ফলস্বরূপ উভয়ের মধ্যে চিরবিচ্ছেদ তৈরি করবে। এবং পরে পুনরায় তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে চায় সেক্ষেত্রেও তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হয় কিন্তু নারীকেই। এক্ষেত্রে ধর্মগুরুরা যে বিধান ধার্য করে রেখেছে সেটি অত্যন্ত কুরুচিকর। তালাক প্রাপ্তা ওই নারীকে অন্য একটি পুরুষের সাথে বিবাহ দেওয়া হয়। এই বিবাহকে ইসলামি আইনে বলা হয় 'হিল্লাবিবাহ'। এবং শুধু বিবাহ দেওয়ায় নয় দ্বিতীয় পুরুষটির সাথে কমপক্ষে একরাত্রি কাটিয়ে তবেই ওই নারী নিজেকে 'হালালা' (পবিত্র) হিসাবে সমাজের কাছে নিজেকে প্রমান করতে পারবে। তারপর যদি দ্বিতীয় স্বামী তাকে তালাক দেয়, তবেই সে পুনরায় তার প্রথম স্বামীকে বিবাহ করে সংসারে ফিরতে পারবে। কোরানে এই বিধানের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। "তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয়বার) তালাক দেয়া হয়, তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামীর সাথে বিয়ে করে না নেবে, তার জন্য হালাল নয়। অতঃপর যদি দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তাদের উভয়ের জন্যই পরস্পরকে বিয়ে করাতে কোন পাপ নেই।" (সুরা বাকারা : ২৩০ নং আয়াত)[২৩]

এই নোংরা, অশ্লীল বিধানকে মুসলিম নারীরা কোনও দিনই মেনে নিতে পারেনি। অনেক মুসলিম নারীরা সে কারণে তালাকের পর স্বামী ফিরিয়ে নিতে চাইলেও সংসার জীবনে আর ফিরতে চাইনি শুধু মাত্র এই ঘৃণ্য পথ অতিক্রম করতে হবে বলে। তাদের মনে জমা দীর্ঘদিনের ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে স্বামীর সংসার থেকে নিজেদের মুক্ত করে বাবা মায়ের বাড়িতে ফিরে স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্বাহ করে জীবন যাপনের মাধ্যমে। এই বর্বর প্রথার বিরুদ্ধে মুসলিম নারীরা যে একদিন প্রশ্ন তুলতে পারে, সেকথা ভেবে ধর্মীয় ফতোয়া দাতারা বিধান ঠিক করেই রেখে গেছেন। এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁদের যুক্তি-"যে হালালা করে এবং যার জন্য হালালা করা হয় উভয়ের উপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) অভিসম্পাত করেছেন।"[২৪] (তিরমিযী শরীফ: ১১২০) এই হাদিস এর ব্যাখ্যা করে এখনকার ধর্মগুরুদের বক্তব্য "তিন তালাকের পর প্রথম স্বামীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা করে সাময়িকভাবে অন্য কাউকে বিবাহ করার পদ্ধতি একেবারে বৈধ নয়।"[২৫] এই প্রথা যদি বৈধ না হয় তাহলে এতকাল ধরে এরকম একটা অশ্লীল প্রথা সমাজে প্রচলন হবে কেন? সব প্রশ্নকে এভাবে উচিত নয়, বৈধ নয়, ঘৃন্যতম প্রথা বলে নিজেদের দায় তো তাঁরা এড়িয়ে যেতে পারবেন না। মুসলিম পিতৃতন্ত্রের কেবলমাত্র এরকম নীতিমূলক শব্দ প্রয়োগে মুসলিম নারীরা কতটা নিরাপদ সে প্রশ্ন থেকেই যায়। যখন দেখা যায় এমন একপাক্ষিক মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের পরিবর্তন কামনা করলেই এরাই আবার শরিয়ত বিকৃতির নামে গর্জে ওঠে।

মুসলিম উত্তরাধিকার আইন :

নারী–পুরুষ সকলের জীবনে আর্থিক সুনিশ্চতা না থাকলে প্রকৃত স্বাধীনতা কেউ ভোগ করতে পারে না। একটা ইতিবাচক সুনিশ্চিত আর্থিক নিরাপত্তা নারী এবং পুরুষ উভয়কে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। বলা বাহুল্য, অর্থনৈতিক প্রতিষ্টা দ্বারাই একজন ব্যক্তি সমাজে আপন মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে পারে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সব দেশের আইন কানুন তৈরি হয়েছিল পুরুষদের দ্বারা। সমাজে নিজেদের ক্ষমতা ও আত্মমর্যাদা বজায় রাখতে যাবতীয় সামাজিক রীতিনীতি এবং আইন কানুন পুরুষ তৈরি করেছিল নিজেদের স্বার্থের নিরিখে।

সে কারণে কম বেশি প্রায় সকল দেশের আইন কানুনই নারীকে অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল এমনকি দাসে পরিণত করে রেখেছে। অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করার মতো সামাজিক কোনও কর্মক্ষেত্র নারীদের তো ছিলই না, সেই সঙ্গে পারিবারিক উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতেও নারীদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখে দিয়েছিল পুরুষ সমাজ। পরবর্তীকালে পৈত্রিক সম্পত্তিতে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে ঠিকই কিন্তু তা সহজ ভাবে নয়। ইসলাম পূর্ব আরবীয় সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের সামাজিক অবস্থান খুব একটা উন্নত ছিল না। "ইসলাম পূর্ব আরব সমাজে নারীর অবস্থা সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ধারনা বর্তমান। ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। কারো কারো মতে সে যুগে আরবে নারীর কোন মর্যাদা ছিল না। তারা পুরুষের ভোগ-বিলাসের বস্তু বলে বিবেচিত হত এবং বাজারের পণ্যদ্রব্যের ন্যায় হস্তান্তরযোগ্য ছিল। পিতা বা স্বামীর কোন অংশ তারা পেত না।"[২৬] আরবে ইসলাম আবির্ভাবের পর সামাজিক এবং ব্যক্তিগত স্তরে বিপুল পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। বিশেষ করে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ইসলাম যে সমস্ত আইন প্রণয়ন করেছিল তার মধ্যে অন্যতম হল পারিবারিক উত্তরাধিকার আইন। ইসলামি আইনে পারিবারিক উত্তরাধিকার একটি ব্যাপক অধ্যায় জুড়ে বিস্তারিত। আমরা এখানে শুধুমাত্র উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে মুসলিম নারীদের অধিকার প্রসঙ্গে আলোচনা করব।

ইসলামে বলা হয়েছে নারী এবং পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। কোরান ও হাদিসে যেসব আদেশ ও নিষেধ আছে তা নারী এবং পুরুষের উপর সমান ভাবে প্রযোজ্য। যেমন- নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, এবং অন্যান্য আরোও অনেক সামাজিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষকে সমান আদেশ দেওয়া হয়েছে। কেবল সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও বেশ কিছু সামাজিক রীতিনীতির ক্ষেত্রে সমতার সাথে সাথে 'আদর্শ' কে ইসলাম মানদণ্ড বানিয়েছে। এই 'আদর্শ' হল যাকে যে পরিমাণ দায়িত্ব দেওয়া হয় ঠিক সেই অনুপাতে তাকে অধিকার প্রদান করা। আর এই আদর্শের নিরিখে ইসলাম পুরুষকেই স্থান দিয়েছে অগ্রভাগে। এক্ষেত্রে ইসলাম মনে করে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর থেকে একজন পুরুষের উপরেই সব দায়িত্ব থাকে। বাবা মা, স্ত্রী সন্তান, এমনকি ছোট ভাই বোনদেরও অনেক দায়িত্ব একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের উপর অর্পণ

করেছে ইসলাম। অন্যদিকে কন্যাকে সাধারণত নিজের দায়ভার বহন করতে হয় না। বিয়ে হয়ে গেলে স্বামীর সংসারে চলে যায়, তাই তাকে কোনও দায়িত্ব নিতে হয় না। ইসলামি উত্তরাধিকার বণ্টনের ক্ষেত্রে এই 'আদর্শে' মানদণ্ড বিবেচিত হয়েছিল। পৈত্রিক সম্পত্তিতে কন্যার অংশদারির নির্দেশ কে ইসলামি আইনে ঐতিহাসিক ঘটনা বলে মনে করেন অনেকে। তারা মনে করেন ইসলাম পূর্বে নারীকে সম্পত্তি দেওয়া হত না। কোরানে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে "পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে। আর পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, তা অল্পই হোক অথবা বেশিই হোক, এক নির্ধারিত অংশ।" (সুরা নিসা : আয়াত নং-৭)[২৭] ইসলামি আইনে নারী সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলেও সে পৈত্রিক সম্পত্তির সমান অধিকারী নয়। ইসলামি আইনের মূল কথা হল–"স্বাভাবিকভাবে যাহারা যত বেশি নিকটে, উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে ইসলামি আইন তাহাদের তত বেশি প্রাধান্য দিয়েছে।"[২৮] এক্ষেত্রে ইসলামি দর্শন মনে করে, যে উত্তরাধিকারী জীবনের প্রাথমিক স্তরে থাকে এবং তার উপর যেহেতু অধিক দায়িত্ব অর্পিত হয় সেহেতু পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে সে বেশি অংশ পেয়ে থাকে। আর যে উত্তরাধিকারী জীবনের শেষ স্তরে থাকে এবং তার উপর দায়িত্ব কম থাকে বলে পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে সে কম অংশ পায়। এই কারণে ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে নারীর অংশ পুরুষের অর্ধেক করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কোরানে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে– "আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন তোমাদের সন্তান সন্ততি সম্পর্কেঃ এক ছেলে পাবে দুই মেয়ের অংশের সমান।" (সুরা নিসাঃ আয়াত নং ১১)[২৯]

এটা ঠিক যে ইসলাম পারিবারিক সম্পত্তির অধিকার থেকে মেয়েদের একেবারে বঞ্চিত করে নি। এক সময়ে ইসলামি আইনে যখন সম্পত্তির উত্তরাধিকারে মেয়েদের অধিকার দেওয়া হয়েছিল তখন তা অন্যদের তুলনায় অনেকটা প্রগতিশীল। কিন্তু বর্তমানের সামাজিক পরিস্থিতিতে তা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। অন্য ধর্মের আইন সেই তুলনায় অনেকটা এগিয়ে গেছে। সেখানে ইসলামি আইনে ছেলে এবং মেয়েদের অংশ সমান নয়।

আজকের সমাজে দাঁড়িয়ে মুসলিম সমাজ এরকম বৈপরীত্য নিয়ে চলতে পারে না। পুত্র সন্তান না থাকলে মেয়েরা পৈত্রিক সম্পত্তির সমান ভাগ পায় না। অন্যান্য আত্মীয়রা সম্পর্কের নৈকট্যের পরিপেক্ষিতে অংশীদার হয়। ধরে নেওয়া হয় মেয়েরা শ্বশুর বাড়ি চলে যাবে, সেক্ষেত্রে আপন মেয়ের তুলনায় ভাই বা ভাইপো দের অধিক নিকট সম্পর্কের হিসাবে গন্য করা হয়। ফলে যদি কোনও ব্যক্তির পুত্র সন্তান না থাকে তবে তার উত্তরাধিকারী হিসাবে কন্যা এবং ভাই অথবা ভাইপোরা সমান অংশ পাবে। ইসলামি আইন যে সময়ে গৃহিত হয়েছিল, সেই সময় এবং সমাজের প্রেক্ষাপটে এটাই স্বাভাবিক অথবা বৈপ্লবিক ছিল। এখন আমরা সেই সময় থেকে অনেকটা এগিয়ে এসেছি। মেয়েরা এখন বাবা মায়ের দায়িত্ব নিচ্ছে, নিজের দায়িত্ব নিচ্ছে। বাবা মায়ের সাথে বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ির দায়িত্বও থাকছে। পুরুষের সাথে সমান তালে উপার্জন করে সংসার সামাল দিচ্ছে। যেহেতু এখন মেয়েরাও সকলের সাথে সমানভাবে বাড়তি দায়িত্ব পালন করছে সেহেতু কোরানের মূল ধারনা বা অভিমত ঠিক রেখেও উত্তরাধিকার আইনে যথাযোগ্য পরিবর্তন করা সম্ভব।

> "যখনই কোনো স্তরের বা কোনো শ্রেণির মানুষ পরাধীন বা অবনত অবস্থায় থাকে, তখনই সে দেশের আইন-কানুনের মধ্যে তাদের সে অবস্থার প্রতিফলন দেখা যায়। সব দেশের সামাজিক অবস্থা আইনের মধ্যে একসঙ্গে দেখা যায়, আইনের মধ্যে আয়নার মতো সামাজিক অবস্থা ধরা পড়ে।"[৩০]

আমাদের দেশে মুসলিম নারীরা অবনত ও পরাধীন, কারন তাদের বেলাতেও দেশের আইন কানুনের একই নিয়ম চলে। প্রত্যেক আইনের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় দিক রয়েছে। একথা ঠিক যে কোরানের অনেক আয়াত আছে যেখানে ইসলাম মুসলিম নারীকে অনেক সম্মান ও অধিকার দিয়েছে। আবার কোরানের মধ্যেই এমন কিছু নির্দেশ আছে যা মুসলিম নারীর পক্ষে খুবই অবমাননাকর এবং অসম্মানজনক। ইসলাম ধর্মে নারীকে পুরুষের স্থাবর- অস্থাবর সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে, এমনকি গণ্য করা হয়েছে পার্থিব ভোগ্যবস্তু হিসাবেও।

কোরানে ঘোষণা করা হয়েছে যে, "নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত- খামারের মতো আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু।" (সুরা ইমরান : আয়াত নং- ১৪)।[৩১] নারীকে শুধুমাত্র পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু বলা হয়নি, তা কেমন ভোগ্যবস্তু তাও বলে দেওয়া আছে।–"তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্য ক্ষেত্র, তোমরা শস্য ক্ষেত্রে যেভাবে খুশী যেতে পার।"(সুরা বাকারা : আয়াত নং-২২৩)।[৩২] অর্থাৎ পুরুষ নারীকে যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারে। সেক্ষেত্রে নারী যাতে আপত্তি না করে সে বিষয়ে নারীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আবার যদি কোনও কারণে পত্নী স্বামীর আদেশ অমান্য করে তাহলে কোরানে স্বামীকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে - "পুরুষগণ নারীদের কর্তা... সতী নারী অনুগত.... যখন অবাধ্যতার ভয় কর তখন উপদেশ দাও। শয্যা বর্জন কর, প্রহার কর।" (সুরা নিসা : আয়াত নং-৩৪)।[৩৩] 'পুরুষগণ নারীর কর্তা' এই বিধানে মুসলিম নারীদের ক্ষোভ ও অসন্তোষ হওয়া স্বাভাবিক। তাই নারীকে এই বিষয়ে সাবধান করে দিয়ে বলা হয়েছে– "যা দিয়ে আল্লাহ তোমাদের কাউকে কারও ওপর শ্রেষ্টত্ব দান করেছেন তোমরা তার লালসা করো না। পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য, আর নারী যা অর্জন করে সেটা তার প্রাপ্য।" (সুরা নিসা : আয়াত নং ৩২)।[৩৪] কোরানের এই নির্দেশ গুলি মুসলিম নারীর পক্ষে যে কতটা অসম্মানের তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। মুসলিম নারীকে শুধু অবমাননাই করা হয়নি, যাতে তারা এ বিষয়ে পরবর্তীকালে কোনও প্রশ্ন না তোলে তাই বার বার তাদের জাহান্নামের ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে রাখা হয়েছে। ধর্মের দোহাই দিয়েই, খুব কৌশল করে মুসলিম নারীদের মনে জিইয়ে রাখা হয়েছে জাহান্নামের হাজার রকমের ভীতি। তাঁকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করা হয়েছে, স্বামীর পায়ের নিচেই নাকি মেয়েদের জান্নাত। তা সে স্বামীর চরিত্র কেমন হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি, হতে পারে সে স্বামী লম্পট, বা চরিত্রহীন। মুসলিম নারীরা যাতে না ভাবে যে এগুলি তাদেরকে মিথ্যা ভয় দেখানো হচ্ছে তাই একটি হাদিস মুসলিম ধর্মগুরুদের মুখে প্রায়ই শোনা যায় যে, "হজরত মহম্মদ (সাঃ) স্বচক্ষে দেখেছেন যে যারা দোজখের (নরক) শাস্তি ভোগ করছে ইতিমধ্যেই তারা অধিকাংশ নারী এবং তারা পতিসেবায় ত্রুটি করার জন্যই সেই শাস্তি ভোগ করছে।"[৩৫]

এমনকি হাদিসে মুসলিম নারীদের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নাম করে এটাও বলা হয়েছে যে, "যদি আমি অন্য কাউকে সিজদা করার আদেশ দিতাম তাহলে নারীদেরই বলতাম তাদের স্বামীদের সিজদা করতে।"[৩৬] আর সে কারণে ধর্মের এই সমস্ত বিধান কে হাতিয়ার করে পুরুষ পেয়ে গেছে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের সীমাহীন অধিকার। নারীকে সমস্ত রকম লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, অবমাননার স্বীকার হতে হয় এই সব ধর্মীয় বিধানের কারণেই। কোরানে নারী এবং পুরুষ উভয়কে নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখার কথা বলা হয়েছে। আর ইসলাম ধর্মীয় বিধান দাতারা সেখানে নিজেদের স্বার্থ কায়েম করতে শুধু নারীকেই করে ফেলেছে গৃহবন্দি। "অবরোধপ্রথার উদ্ভব ঘটে নারী সম্পর্কে একটি অত্যন্ত আপত্তিকর ইসলামি ধারণা থেকে যে নারী হচ্ছে 'ফিৎনা'। ইসলামি বিশ্বাস হচ্ছে যে নারীর কাম প্রবল, তা নষ্ট করে দিতে পারে সমাজশৃঙ্খলা; তাই নারীকে রুদ্ধ করে রাখতে হবে অবরোধে। ইসলামি ধারণায় নারী হচ্ছে মানসিক দুর্বল, সে নিজের কামকে বশে রাখতে পারে না; তাই নারীর কামের গ্রাস থেকে সমাজকে বাঁচানোর জন্যে নারীকে আটকে রাখতে হবে অবরোধে, তাকে ঢেকে দিতে হবে বোরকায়।"[৩৭] স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম নারীকে অবরোধে বন্দি করে মুসলিম পুরুষ নিজেদের জন্য উন্মুক্ত করে রেখে দিয়েছে পার্থিব সুখ ভোগের যাবতীয় উপকরণ। লাভ করেছে কোরানের নির্দেশ অনুসারে নারীকে রক্ষা করার অজুহাতে সীমাহীন প্রভুত্ব বিস্তারের অধিকার। সেকারণে কোরানে 'তালাক' শব্দটি ভীষণ অপছন্দীয় হলেও নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে ফতোয়া জারির মাধ্যমে ইসলামি আইন করে দিয়েছে অনেক সহজ। আর এই ফতোয়ার জোরে মুসলিম পুরুষের মনে ধারণা হয়ে গেছে–"ইসলামে বিবাহবিচ্ছেদ বা তালাক গেলাশ থেকে জল ঢালার থেকেও সহজ- স্বামীর জন্যে; আর স্ত্রীর জন্যে ফাঁসির রজ্জু খোলার মতোই কঠিন।"[৩৮] তাই অধিকাংশ মুসলিম দেশের নারীরা 'তালাক' নামক এই অস্ত্রটির তলায় দিন কাটায় অত্যন্ত ভীরুতার সাথে। তাদের সাংসারিক জীবন অতিবাহিত করতে হয় অতি সাবধানে, যেকোনো মুহূর্তে এই একটি অস্ত্রের আঘাতে ছিন্ন হয়ে যেতে পারে তার সংসারের বন্ধন। একইভাবে বহুবিবাহের পক্ষে কোরানের শর্তকে তোয়াক্কা না করে, স্ত্রীদের নাম মাত্র সমান আধিকারের ফতোয়ার বুলি দিয়ে বিধান কর্তারা নিজেরাই ঘরে রেখে দিয়েছে একাধিক স্ত্রী সংসর্গের সুযোগ।

একমাত্র ইসলামি উত্তরাধিকার আইনকে এরা কোনোরকম বিকৃত করেনি। যদিও সম্পত্তির অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রেও পুরুষদের 'আদর্শ' মানদণ্ডের নিরিখে এগিয়ে রাখা হয়েছে। কোরানের নির্দেশ অনুসারেই পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকার মুসলিম নারীরা পায়। তবে এক্ষেত্রেও মুসলিম নারীরা বঞ্চনার স্বীকার হয় নিজের পরিবারের কাছ থেকে। শরিয়ত আইন অনুসারে মুসলিম নারীদের জন্য নির্ধারিত সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় সম্পর্কের আবেগকে কাজে লাগিয়ে।

ইসলামি আইন যে সময়ে তৈরি হয়েছিল, সে সময়ের সামাজিক পরিস্থিতি, আরবীয়দের মানসিকতা এবং সেই সমাজের মানুষের জীবনের দাবিতে তা হয়েছিল। সেটাই স্বাভাবিক, আরবের এক বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতি অনুযায়ী ইসলামি আইনে বহুবিবাহ, তালাক প্রভৃতি প্রথাগুলি গৃহীত হয়েছিল। সেই সময়ের মানুষের জীবনের দাবি মেটাতে সেগুলি কাজেও লেগেছিল। পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মের আইনই প্রণয়ন হয়েছে সময়ের দাবিকে মেনেই। আবার প্রতিটি ধর্মের আইনের পরিবর্তনও হয়েছে সময়ের দাবিতেই। সেজন্য আরবীয় সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে তৈরি হওয়া আইনের নতুন অধ্যায় ভারতে শুরু হয়েছিল ইংরেজ শাসন ব্যবস্থার সময় থেকে, শুধুমাত্র প্রত্যেক ধর্মের ব্যক্তিগত আইনগুলি বাদ দিয়ে। কিন্তু পরিবর্তনশীল জগতের সাথে সাথে এই প্রথাগুলি হয়ে পড়েছে ভীষণভাবে গুরুত্বহীন। তবুও আমাদের দেশের মুসলিম পিতৃতন্ত্র শরিয়ত বিকৃতির দোহাই দিয়ে কিছুতেই পরিবর্তন আনতে চাইছেন না। আর এই স্তবিরতাময় ইসলামি আইনের সব থেকে বেশি স্বীকার হচ্ছে মুসলিম নারী। কারণ, "মুসলিম নারীর অবদমনের সব আইন অপরিবর্তিত রেখে, ইসালামি দণ্ডবিধি আইন, কার্যবিধি আইন, ভুমি আইন, রাজস্ব আইন, ইত্যাদির পরিবর্তে প্রবর্তিত হল ইঙ্গ-ভারতীয় আইন। বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও উত্তরাধিকার আইনের পরিবর্তন চাইলে মুসলিম পিতৃতন্ত্র আজও গরজে ওঠে শরিয়তের শুদ্ধতা রক্ষার অজুহাতে।"[৩৯] আসলে হিন্দু সমাজের রামমোহন, বিদ্যাসাগরের মতো কোনও মহাপুরুষ মুসলিম সমাজে জন্মায়নি মুসলিম নারীর যন্ত্রণাকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করার জন্য। যদিও মুসলিম সমাজের বিধবাবিবাহ, কিংবা নারীদের সম্পত্তির অধিকার নিয়ে গলা ফাটানোর প্রয়োজন ছিল না।

কিন্তু বাংলার মুসলিম সমাজের প্রাচীন কুসংস্কারছন্নতা, ধর্মের অবক্ষয় রুখতে, তেমন কোনও সংস্কার আন্দোলনও হয়নি। ফলে বাঙালি মুসলমান সমাজের মেয়েদের আজও বহন করে চলতে হচ্ছে মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণাকে। অন্ততপক্ষে মুসলিম নারীদের জন্য কোরানে যে সকল নির্দেশ দেওয়া আছে সেগুলি বাস্তবায়িত করার জন্য মুসলিম সমাজের বলিষ্ঠ কোনও পুরুষ উদ্যোগ নেয় নি। এই সময়ে বেগম রোকেয়া সহ বেশ কিছু মুসলিম নারীই প্রথম নিজেদের ধর্মীয় গণ্ডি থেকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন। তাঁর দেখানো পথ ধরেই মুসলিম সমাজে নারী জাগরণের পথ গুটি পায়ে বেশ খানিকটা অগ্রসর হয়েছিল। এর রেশ স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও কিছুটা ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে দেশভাগ এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতি কারণে সেই পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়ে মুসলিম সমাজে পুনরায় নেমে এসেছিল ধর্মীয় কুসংস্কারের ছায়া। বিশেষত দেশভাগের পর এপার বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের সিংহভাগই থেকে গিয়েছিল নিম্নবিত্ত শ্রেণির। শিক্ষার অভাবে ধর্মের মর্ম বাণী যথাযথ ভাবে পৌঁছে দেওয়ার ভার এরা যাদের হাতে অর্পণ করেছিল তারাও প্রকৃত শিক্ষার অভাবে এবং কিছুটা অসদিচ্ছায় ধর্মের আদর্শ সঠিকভাবে মানুষের মধ্যে প্রেরণ করতে পারেনি। ফলে এই সময়ে বহুবিবাহ, তালাক প্রথার উৎপীড়ন বাংলার মুসলমান সমাজে মহামারির আকার ধারণ করেছিল। এপার বাংলার বেশকিছু সমাজমনস্ক সাহিত্যিকদের কথাসাহিত্যের প্রাঙ্গনে ধরা পড়েছে মুসলিম সমাজে নারীদের জীবনে কোথাও ঘটে যাওয়া সেই সব কাহিনির সত্যতা। সেই সত্যের সন্ধান করেছি পরের অধ্যায়ে নির্বাচিত কয়েকটি কথাসাহিত্যের মাধ্যমে।

তথ্যনির্দেশ

১। আফরোজা খাতুন, *'বাংলা কথাসাহিত্যে মুসলিম অন্তঃপুর',* দেজ, কলকাতা, ২০১১, পৃ- ২৬

২। গাজী শামসুর রহমান, *'স্যার আবদুর রহীম-ইসলামী আইনতত্ত্ব',* ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ ১৯৮০, পৃ – ৩

৩। মইনুল হাসান, *'ইসলামী আইন',* উদার আকাশ, ঘটকপুকুর, ২০১৮, পৃ- ১৬

৪। মইনুল হাসান, পূর্বোক্ত, পৃ- ১৮

৫। গাজী শামসুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ- ২৭

৬। w.w.w. Bisoy. com

৭। আফরোজা খাতুন, পূর্বোক্ত, পৃ- ২৮

৮। ডঃ মহঃ মসিহুর রহমান, *'ইসলামে নারীর অধিকার',* বিশ্ববঙ্গীয়, কলকাতা, ২০১৭, পৃ- ২৮

৯। মাওলানা মোবারক করীম জওহর (অনুবাদক), *'কোরান শরীফ',* হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪, পৃ- ৩৮।

১০। মাওলানা মোবারক করীম জওহর (অনুবাদক), *'কোরান শরীফ',* পূর্বোক্ত, পৃ- ৬০

১১। মাওলানা মোবারক করীম জওহর (অনুবাদক), *'কোরান শরীফ',* পূর্বোক্ত, পৃ- ৭০

১২। মইনুল হাসান, পূর্বোক্ত, পৃ- ৬৫

১৩। গাজী শামসুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ- ২৯

১৪। মাওলানা মোবারক করীম জওহর (অনুবাদক), *'কোরান শরীফ',*হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪, পৃ- ৩৫

১৫। অধ্যক্ষ ইয়াকূব শরীফ (অনুবাদক), *'আবু দাঊদ শরীফ' (প্রথম খণ্ড),* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯০, পৃ- ১২২

১৬। অধ্যক্ষ ইয়াকূব শরীফ (অনুবাদক), *'আবু দাঊদ শরীফ' (প্রথম খণ্ড),* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯০, পৃ-১৭১

১৭। ডঃ মহঃ মসিহুর রহমান, *'ইসলামে নারীর অধিকার',* বিশ্ববঙ্গীয়, কলকাতা, ২০১৭, পৃ- ১৭৪

১৮। মাওলানা মোবারক করীম জওহর (অনুবাদক), *'কোরান শরীফ',* হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪, পৃ- ৩৮

১৯। মাওলানা মোবারক করীম জওহর (অনুবাদক), *'কোরান শরীফ',* হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪, পৃ- ৭০

২০। মাওলানা মোবারক করীম জওহর (অনুবাদক), *'কোরান শরীফ',* হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪, পৃ- ৩৮

২১। ডঃ মহঃ মসিহুর রহমান, *'ইসলামে নারীর অধিকার',* বিশ্ববঙ্গীয়, কলকাতা, ২০১৭, পৃ-১৯০

২২। আফরোজা খাতুন, পূর্বোক্ত, পৃ-২৩২

২৩। মাওলানা মোবারক করীম জওহর (অনুবাদক), *'কোরান শরীফ',* হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪, পৃ- ৩৭

২৪। মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ (অনুবাদক), *'তিরমিযী শরীফ'* (তৃতীয় খণ্ড), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫, পৃ- ৪০৪

২৫। ডঃ মহঃ মসিহুর রহমান, *'ইসলামে নারীর অধিকার',* পূর্বোক্ত, পৃ- ১৮৮

২৬। আফরোজা খাতুন, পূর্বোক্ত, পৃ- ২৬

২৭। মাওলানা মোবারক করীম জওহর (অনুবাদক), *'কোরান শরীফ',* পূর্বোক্ত, পৃ- ৬১

২৮। ডঃ মহঃ মসিহুর রহমান, *'ইসলামে নারীর অধিকার',* বিশ্ববঙ্গীয়, কলকাতা, ২০১৭, পৃ- ৮৪

২৯। মাওলানা মোবারক করীম জওহর (অনুবাদক), *'কোরান শরীফ',* পূর্বোক্ত, পৃ- ৬২

৩০। তাহা ইয়াসিন ও অনুপ সাদি (সম্পাদনা), *'নারী',* কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ- ২৭১

৩১। মাওলানা মোবারক করীম জওহর (অনুবাদক), *'কোরান শরীফ',* পূর্বোক্ত, পৃ- ৪২

৩২। মাওলানা মোবারক করীম জওহর (অনুবাদক), *'কোরান শরীফ',* পূর্বোক্ত, পৃ- ৩৭

৩৩। মাওলানা মোবারক করীম জওহর (অনুবাদক), *'কোরান শরীফ',* পূর্বোক্ত, পৃ- ৬৪

৩৪। মাওলানা মোবারক করীম জওহর (অনুবাদক), *'কোরান শরীফ',* পূর্বোক্ত, পৃ- ৬৪

৩৫। গিয়াসুদ্দিন, ইসলাম ধর্ম ও যুক্তি, ক্যাম্প, কলকাতা, ২০১৪, পৃ- ৬১

৩৬। মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ (অনুবাদক), *'তিরমিযী শরীফ' (তৃতীয় খণ্ড),* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫, পৃ- ৪৪২

৩৭। হুমায়ুন আজাদ, *'নারী',* আগামী প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ, বাংলাদেশ, ২০০০, পৃ- ২৯৭

৩৮। হুমায়ুন আজাদ, *'নারী',* আগামী প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ, বাংলাদেশ, ২০০০, পৃ- ৮৮

৩৯। আফরোজা খাতুন, পূর্বোক্ত, পৃ-২৩২

তৃতীয় অধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকের কথাসাহিত্যে মুসলমান নারী

"পিতৃতন্ত্র প্রণয়ন করেছে বিপুল পরিমাণ আইন বা বিধিবিধান, যার এক নৃশংস অংশ সুপরিকল্পিতভাবে বানানো হয়েছে নারীদের পীড়নের জন্যে। পিতৃতন্ত্রের আইনসংশ্রয়টি তার বলপ্রয়োগ সংস্থা, যার বিধিগুলো এক বহুমুখি হিংস্র খড়্গ, যা নারীর জীবনের দিকে উদ্যত হয়ে আছে কয়েক হাজার বছর ধরে, এবং ওই খড়্গের ধারাবাহিক বলি নারী। ওই বিধিগুলো তৈরি করেছে পুরুষ, তৈরির সময় নারীর কোনো বক্তব্য শোনে নি; নারী সম্পর্কে প্রথম থেকে শেষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরুষ, তার শাস্তির সব বিধি প্রণয়ন করেছে নারীবিরোধী পুরুষতন্ত্র। পুরুষ নিজে প্রণয়ন করেছে ওই নিষ্ঠুর সংহিতাগুলো, নারীকে স্থান দিয়েছে দণ্ডিতের শ্রেণিতে; ওই বিধিগুলোকে প্রচার করেছে ঐশী বলে।"[১] এইভাবে নারীর নিত্যদিনের জীবন সব থেকে বেশি শৃঙ্খলিত হয়েছে প্রত্যেক ধর্ম, সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত আইন বা ব্যবহারিক বিধি দ্বারা। এই বিধি গুলোই নির্ধারণ করেছে নারীদের সামাজিক ভুমিকা কি হবে, তাদের পারিবারিক জীবনের নিয়ম কানুন কেমন হবে। বিশেষ করে বিবাহ, সম্পত্তির অধিকার, বিবাহ বিচ্ছেদ এবং আরও অনেক ক্ষেত্রে পৃথিবীর সব ধর্মের আইনই তৈরি হয়েছে পুরুষদের দৃষ্টিতে, একপাক্ষিক বিচারে। তাই পুরুষ প্রণীত আইনে নারীদের আধিকার ও সম্মান প্রদানের বিষয় নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

ইসলাম ধর্ম যেহেতু অনান্য ধর্মের অনেকটা পড়ে এসেছে সেকারণে এই ধর্ম নারীদের কিছুটা সম্পত্তির অধিকার এবং বিবাহ চুক্তিতে নারীদের অন্য ধর্মের থেকে বেশ খানিক অধিকার প্রদান করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ইসলাম ধর্মের বিকাশ কম হওয়ায় এই ধর্মই বর্তমানে পৃথিবীর সব থেকে উগ্র পিতৃতন্ত্রের রূপ নিয়েছে। ইসলাম নারীকে কিছুটা অধিকার দিয়েছে ঠিকই কিন্তু এই ধর্মই নারীকে সবথেকে বেশি শৃঙ্খলিত করেছে। নারীকে অবরোধে বন্দি করে তার মানসিক বিকাশের পথকে রুদ্ধ করেছে।

আর এই অবরোধের কারণে মুসলিম নারীদের এক বিশাল অংশ বঞ্চিত হয়েছে আর্থসামাজিক ক্ষেত্র থেকে।

আরবের সামাজিক জীবনের নৈতিক অধঃপতনের কারণে নারীদের পর্দাপ্রথা অপরিহার্য ছিল। আর আজও মুসলিম নারীরা সেই যুগের প্রয়োজনে চালু হওয়া পর্দা থেকে নিজেদের পুরোপুরি মুক্ত করতে পারেনি। সেজন্য ধর্মের কারণে নিজেদের পর্দানশীন করে রাখতে বাধ্য হওয়া মুসলিম নারীদের জীবন সংসার এবং ধর্মীয় বিধি পালনের মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ। ইসলামীয় নীতিতে শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী- পুরুষ উভয়ের গুরুত্বই স্বীকৃত। কিন্তু সেই শিক্ষার ক্ষেত্র হজরত মহম্মদ তাঁর সময়ে দাঁড়িয়ে নিজের স্ত্রী- কন্যা দের জন্য কীরূপ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছিলেন সেই নীতির উপর নির্ভর করেছে। ফলত মুসলিম নারীদের শিক্ষার ক্ষেত্রও সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী পর্দার অন্তরালে বসে আরবি কিংবা ফার্সি শিক্ষা অবধি গড়িয়েছে। আর বাঙালি মুসলিম নারীদের জীবনে সেই শিক্ষা তোতাপাখির মতো অনুচ্চ স্বরে আরবি ভাষায় লেখা কোরান পাঠ করা পর্যন্ত এগিয়েছিল। যার একটি অর্থও তারা কোনদিন উপলব্ধি করতে পারেনি। মুসলিম নারী কোনদিন বুঝতেই পারেনি যে ইসলাম ধর্মে বিবাহচুক্তি, তালাকনামা, কিংবা সম্পত্তির ক্ষেত্রে তাদের কতটা অধিকার দিয়েছে। ফলে তারা যাদের হাতে ধর্ম শিক্ষা প্রদানের ভার অর্পণ করেছে সেই মুসলিম পিতৃতন্ত্র নিজেদের সুবিধা মতো ধর্মের নীতিকে প্রয়োগ করে চলেছে। সেকারণে ইসলামি বিবাহ আইনে নারীর সম্মতি সর্বাগ্রে স্বীকৃত হয়েও মুসলিম পিতৃতন্ত্র তা ব্যবহার করে নিজেদের মতো করে। তালাকও সেজন্য কোরানে উল্লিখিত সব চেয়ে নিকৃষ্ট শব্দ হয়েও অপপ্রয়োগ ঘটেছে সব থেকে বেশি। আর বহুবিবাহের পক্ষে তারা নিজেদের সুবিধা মতো দেখিয়েছে খোঁড়া যুক্তি। আর তাই আরবের এক ক্রান্তিকালীন সময়ে তৈরি হওয়া ইসলামি আইন বিংশ শতাব্দীর ক্রমবর্ধমান শিক্ষার আলোকে দাঁড়িয়ে বাঙালি মুসলিম নারীর জীবনকে কতটা বিপর্যস্ত করেছে, তাদের সামাজিক অবস্থান ঠিক কতটা প্রশ্ন চিহ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে তা একটি পৃথক অনুসন্ধানের দাবি রেখেছে। সেই দাবিতেই সন্ধান করেছি বিশ শতকের শেষ দুই দশকের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কথাসাহিত্যে।

এগুলি হল- সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'অলীক মানুষ' (১৯৮৮), আবুল বাশারের 'ফুলবউ' (১৯৮৮), 'ধর্মের গ্রহন' (১৯৯২), আফসার আমেদের 'আত্মপরিচয়' (১৯৯০), 'অন্তপুর' (১৯৯৩), 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিসসা' (১৯৯৫), 'দ্বিতীয় বিবি'(১৯৯৭)।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর 'অলীক মানুষ' (১৯৮৮) উপন্যাসে মুসলিম সমাজের অন্তর্নিহিত সূক্ষ ধর্মীয় ভাবনা, সংস্কার এবং এই সমাজের গভীর কিছু সমস্যার কথা নিপুণ সমাজমনস্ক দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র পীর বদিউজাম্মানকে লেখক মুসলিম পিতৃতন্ত্রের এক বলিষ্ট প্রতিনিধি হিসাবে খাঁড়া করেছেন। যিনি নিজেকে পীর মহিমায় প্রচার করে সমাজে সম্মান ও খ্যাতির উচ্চশিখরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। ধর্মের দোহাই দিয়ে বদিউজাম্মান মৌলাহাটির সমস্ত নারীদের বাধ্য করেছেন গৃহে বন্দি থাকতে। অবরোধে বন্দি থাকতে বাধ্য মুসলিম নারীরা বাইরের মুক্ত পরিবেশ থেকে বঞ্চিত হয়ে একসময় নিজেদের খাঁচায় বন্দি প্রাণীর মতোই দুর্বল ভাবতে শুরু করে। তাই পীর বদিউজাম্মানের স্ত্রী সাইদা যখন আচ্ছাদন দেওয়া গরুর গাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে নদীর দিকে অগ্রসর হয়, তখন তাকে দেখে ঔপন্যাসিকের মনে হয়েছে "এমন সময় তাঁকে খাঁচা থেকে বেরিয়ে পড়া পাখির মতো লাগে। নড়বড় করে পা ফেলেন। দুনিয়ার প্রকাশ্য মাটিতে হাঁটতে তাঁর যেন কষ্ট হয়। বহুকাল ধরে পাতার তলায় চাপাপড়া ঘাসের মতো বিবর্ণ তাঁর গায়ের রঙ। সামান্য দূরে একটি কাশঝোপ তাঁর লক্ষ্য ছিল। কিন্তু কিছুতেই যেন পৌঁছুতে পারছিলেন না সেখানে।"[২] ইসলামি শরিয়ত মুসলিম নারীকে শুধু পর্দার অন্তরালে পাঠিয়ে ক্ষান্ত হয়নি, সেই সঙ্গে মুসলিম নারীর কণ্ঠস্বরকে ধর্মের বিধানের মোড়কে রুদ্ধ করেছে। তাই ঈষৎ উচ্চস্বরে মুসলিম মেয়েদের কথা বলা ইসলামি শরিয়ত বিরুদ্ধ। কিন্তু সাইদা খানদানি পরিবারের মেয়ে হলেও তাঁর মধ্যে বিচার বিবেচনার ক্ষমতা প্রবল। বাপের বাড়িতে বোরখা পড়ার প্রচলন থাকলেও সে তা মেনে চলত খুব কম। বিয়ের পর বুজুর্গ স্বামীর কাছে প্রতি পদে শরিয়তি বিধান মেনে চলতে বাধ্য হয়েছে সে, তবুও তার পরিণত বয়সের নিজস্ব চিন্তা ভাবনার পরিসরকে বিলুপ্ত হতে দেয়নি।

তাই স্বামী ধর্মের বিধান প্রয়োগ করে কণ্ঠরোধ করতে চাইলেও সাইদা নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী সে নিয়ম লঙ্ঘন করেছে। সেকারণে এক বিশেষ পরিস্থিতিতে ছোটো ছেলের জন্য চিন্তিত সাইদা গরুর গাড়ির ফাঁক দিয়ে হঠাৎ "তিনি শফিকে দেখতে পেয়ে শরিয়তি অনুশাসন তুচ্ছ করে ঈষৎ চড়া গলায় ডাকলেন শফি! শফি! পর্দাব্যূহের ফাঁকে তার পাতাচাপা ঘাসের মতো ফ্যাকাশে আর কোমল হাতখানিও নড়তে লাগল।"[৩]

মুসলিম নারীর কণ্ঠকে রোধ করে, তাকে আবদ্ধ বাড়ির চারদেওয়ালের অন্তরালে বন্দি করে ধর্মরক্ষা করতে বাধ্য করেন ধর্মগুরুরা। 'অলীক মানুষ' উপন্যাসে ফরাজি ধর্মগুরু বদিউজাম্মান মৌলাহাটি গ্রামে আসার সাথে সাথে মহিলারা খাঁচায় বন্দি হয়ে পড়ে। এর আগে সেখানকার মুসলিম নারীরা পর্দা প্রথা তেমন ভাবে মেনে চলত না। ক্ষেতে খামারে কাজ করার জন্য তাদের বাইরে বেরতেই হতো। এই ভাবে ধর্মীয় ফতোয়া জারি করে মুসলিম নারীকে গৃহে বন্দি করে তার অর্থনৈতিক ভিত্তিকে দুর্বল করে দেওয়া হয়। ফলে তারা গড়ে তুলতে পারে না অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতা, প্রতিনিয়ত পিছিয়ে পড়ে সামাজিক প্রতিযোগিতার আসর থেকে। এর বাস্তব চিত্র ধরা পড়েছে এই উপন্যাসে। বদিউজাম্মানের বেয়ান বিধবা দরিয়াবানু মাঠের কাজ কর্ম নিজেই দেখাশোনা করত। দুই মেয়ের এই পরিবারে বিয়ে দেওয়ার পর গ্রামের গণ্যমান্য বেয়াই এর সম্মান রক্ষার্থে মাঠের কাজ কর্ম দেখাশোনার কাজ আর তেমন ভাবে করতে পারেনি। তার জন্য সে কতটা আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা বেয়ান সাইদা বেগমের কাছে স্বীকার করেছে।

কিন্তু পরিণত বয়সের সাইদার কাছে বাস্তব জীবনের দাবি অনেক বড়ো। সে তার ধুলো- মাটি ভরা বাস্তব সংসারের মধ্যে দিয়ে বুঝেছে জীবনের যন্ত্রণা। তাই গ্রামের চাষি বাড়ির মেয়ে আইমনির বেপর্দা হয়ে ঘোরা সম্পর্কে বড় বৌমা রেজি কথা তোলায় তাকে মৃদু ধমক দিয়ে সাইদা বলে ওঠে- "আর বেপরদা হয়ে ঘোরে তো কী হয়েছে? চাষিবাড়ির বউঝিরা পরদা করে বসে থাকলে সংসার চলবে ?"[৪] সংসারের অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্ত করতে মহিলাদেরও যে গৃহের অন্তরাল থেকে বাইরে আসাটা প্রয়োজন।

এই সত্যটা সাইদা বেগম নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করলেও মুসলিম পিতৃতন্ত্রের প্রতিনিধি বদিউজাম্মান সে সত্যটা স্বীকার তো করেইনি উল্টে তাদের গৃহের খাঁচায় বন্দি করে খাঁচার কুলুপ টুকুও বন্ধ করে দিয়েছে। পির সাহেবের মেজো বৌমা রুকুও বিয়ের পর বাধ্য হয়েছে এরকম কুলুপ আঁটা খাঁচায় বন্দি জীবন যাপন করতে। ফলে তারপর থেকে বাইরের সমাজের কোনও কিছুই চোখে দেখার তার সুযোগ হয়নি। অন্ধকার খাঁচায় বদ্ধ প্রাণীর মতো যন্ত্রণাময় জীবন কাটানোর অব্যক্ত কাহিনী রুকু দীর্ঘদিন পর ব্যক্ত করেছে নাতনি কচির কাছে। পিরসাহেব শ্বশুরের পোষা জিন-পরিদের অলৌকিক ঘটনার কথা অন্দরে বসে রুকু শুধু শুনেছে, নিজের চোখে দেখার মতো সুযোগ কেন হয়নি তার কারণ জানিয়েছে কচিকে "কী করে দেখব বল? হিজরি ১৩১৩ সনে শ্বশুরসাহেব মৌলাহাটে এলেন। সেই থেকে খাঁচায় ঢুকলাম! হিজরি ১৩১৪ সনে আশ্বিন মাসে আমাদের দু বহিনের শাদি হল। খাঁচার দরজায় কুলুপ পড়ল।"[৫] মুসলিম সমাজের এমন অতীতমুখীনতা মুসলিম নারীর জীবনে আধুনিক সমাজের মর্মবাণী প্রবেশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ধীরে ধীরে তারা দূর্বল প্রাণীতে পরিণত হয়।

'অলীক মানুষ' উপন্যাসে মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের বেশ কিছু প্রসঙ্গ লেখকের নিপুন সমাজ পর্যবেক্ষণ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। মৌলাহাটে আসার পর থেকে সাইদা বেগম নিসঙ্গ হয়ে পড়েন স্বামীর উদাসীনতায়। বিকলাঙ্গ পুত্র, পক্ষাঘাতগ্রস্ত শাশুড়ির সেবা যত্নের সমস্ত দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করে স্বামী পাশের মসজিদে পীর সেজে পরকালের জন্য পুন্যি অর্জন করতে ব্যস্ত। সংসারের প্রতি দায়িত্বহীন হলেও একদিন প্রাকৃতিক দুর্যোগের রাত্রিতে বদিউজাম্মান নিজেকে আবিস্কার করেন- "তিনি তো সর্বত্যাগী সাধকপুরুষ নন। তিনি ভ্রান্ত মতানুগামী সুফিও নন। তিনি ওহাবপন্থী ফরাজি মুসলিম। ইহলোকের সবরকম নৈতিক সুখ উপভোগ করাই তো যথার্থ ইসলাম।"[৬] তাই দীর্ঘদিনের ক্ষুধার্ত শরীর নিয়ে পার্থিব সুখ ভোগের জন্য স্ত্রীর কাছে ছুটে আসে পীর সাহেব। কিন্তু বালিকা সাইদার মন ততদিনে পরিপূর্ণ গৃহিণীর নিটোল যুক্তিতে ভরপুর। ধর্মের যুক্তিহীন ফতোয়া আরোপ করে সেই মনকে পীর সাহেব কিছুতেই বশ করতে পারেনি। সাইদা তার বাস্তব বুদ্ধি দ্বারা স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের অভিলাষের কথা টের পায়।

ইসলামি আইনের দুর্বলতা স্বামীর সম্পর্কে স্ত্রীদের অবিশ্বাস ঘনিয়ে আনতে সহায়ক হয়। তাই সাইদার মনে এই সন্দেহের বীজ দানা বাঁধলেও সে জানে স্বামীকে নিরস্ত করার মতো কোনও বিধি ইসলাম মুসলিম নারীদের দেয়নি। ইসলামি বিধি নারীকে দিয়েছে কেবল স্বামীকে অন্যের সাথে ভাগ করে নেওয়ার অবকাশ। কিন্তু সে পথ সাইদার মতো প্রতিটি মুসলিম নারীর কাছে অত্যন্ত অসম্মানজনক। তাই স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ সম্ভাবনার অপমানে আতঙ্কিত সাইদা বেগম স্বামীর ডাকে সাড়া দিতে পারেনি। এমনকি স্বামীর ডাকে সাড়া দেওয়ার পক্ষে কঠোর কোরানের বাণীকেও সে ভয় করেনি। নিজের অস্তিত্ব রক্ষার সঙ্কটে সে এতটাই আতঙ্কিত যে স্বামীর আশ্বাসবাণীও মনের সে ভার লাঘব করতে পারেনি। তার স্বামী তাকে আশ্বাসপূর্ণ যুক্তি দেখিয়ে বলেন- "আমার হুজুর পয়গম্বর সাহেব কতগুলো নিকাহ করেছিলেন তুমি তো জানো! কিন্তু আমি নাদান আদমি সাইদা! এই দেখো না, তোমার ওপরই কত অবিচার করি- আবার নিকাহের কথা কি আমার ভাবা সাজে?"[৭] এতেও সাইদার মন থেকে সন্দেহের মেঘ দূর হয়নি। কারণ একাধিক বিবাহের প্রসঙ্গে হুজুর পয়গম্বরের উদাহরণ নিয়ে আসার মধ্যে তার স্বামীর মনেও যে দ্বিতীয় বিবাহের সুপ্ত ইচ্ছা রয়েছে তা সাইদা অনুভব করতে পেরেছে।

আসলে সাইদা মুসলিম নারীর জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছে মুসলিম ধর্মজীবী পুরুষরা দ্বিতীয় স্ত্রী সঙ্গ করার স্বপক্ষে হুজুর পয়গম্বরদের নজির নিয়ে এসেই যুক্তি খাঁড়া করতে পারে। তাই বদিউজাম্মানের দূর্বল যুক্তি আর সম্ভাবনাময় ঘটনার আস্থিরতায় সাইদা স্বামীর কাছ থেকে নিজেকে ইচ্ছা করেই দূরে সরিয়ে নেয়। কিন্তু একজন 'নাদান আওরাতের' এতো অহংকার কেন সহ্য করতে যাবে সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তিশালী পুরুষ বদিউজাম্মান। তাই সাইদার অহম্মিকাকে চূর্ণ করতে দ্বিতীয় বিবাহ করার কথাই ভাবে সে। আর সমাজে নিজের এই কাজের সমর্থনে খাঁড়া করে ছেঁদো যুক্তি- "আরে নাদান বেঅকুফ! পবিত্র কেতাবে বলা হয়েছে, চাষী যেমন তার শস্যক্ষেত্রের দিকে যায়, পুরুষ যাবে তার আওরতের দিকে। পবিত্র কেতাবে আরও আছে : আউরত তার পুরুষের খাহেস পূর্ণ করতে সবসময় তৈরি থাকবে, যদি সে রজঃস্বলা না হয়।"[৮]

পবিত্র কোরানে স্বামীর যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য নারীর প্রতি অনেক নির্দেশ রয়েছে, সেটা জানার পরেও সাইদার নারীসত্ত্বা স্বামীর খাহেস পূরণের জন্য তার মনকে তৈরি করতে পারেনি। ভালবাসাহীন দেহ ভোগে বাধা দিয়ে সাইদা সমাজের কাছে নিজের মর্যাদা ছিনিয়ে নিতে পবিত্র কোরানের বানীকেও ভয় করেনি। ফলে এরকম বেহরম (নিষ্ঠুর) নারীকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে বদিউজাম্মান কুঠো আবদুলের বউ ইকরাতনকে নিকা করে বসে।

পীরসাহেব ইকরাকে বিবাহ করে হজরত মহম্মদের পথ অবলম্বন করলেন। অথচ কোরানের নির্দেশ অনুযায়ী মুসলমান ইচ্ছা করলেই একাধিক বিবাহ করতে পারেনা। ইসলামি শাস্ত্র চর্চায় দিবারাত্রি নিয়োজিত বদিউজাম্মান একাধিক বিবাহের নির্দেশে কোরানের শর্তের কথা আওড়েছেন বহুবার। তাঁর পুত্র শফিউজাম্মানের উক্তিতে পীরসাহেবের সেই বক্তব্য ধরা পড়েছে-

> "কিন্তু আমার পিতা ইকরাকে বিয়ে করেছিলেন, ভাবতে অবাক লাগল। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলাম না। পিতার মুখে অসংখ্যবার শাস্ত্রীয় বাচন শুনেছি, যা তিনি জীবনযাপনেও সতর্ক এবং দৃঢ়ভাবে পালন করতেন, 'হে মুসলমান! পাক কেতাবে আল্লাহ বলেছেন, যদি মনে কর একাধিক আওরতের প্রতি সমান আচরণ ও সুবিচার করতে পারবে, তবেই দুটি, তিন এবং চার পর্যন্ত নিকাহ করতে পার'। তাছাড়া তিনি কোথাও কেউ দ্বিতীয় বিবাহ করছে শুনলে ক্ষুব্ধ হতেন। সতর্ক করে দিয়ে শাস্ত্র আবৃত্তি করতেন।"[৯]

এইভাবেই ধর্মগুরুরা ধর্মের নির্দেশ জানা সত্ত্বেও প্রয়োজন অনুযায়ী সেই নির্দেশ কে কাজে লাগিয়ে নতুন করে ব্যাখ্যা প্রয়োগ করেন। আবার সমাজে নিজের ক্ষমতার দাম্ভিকতায় ইচ্ছা অনুযায়ী বিবাহ যেমন করতে পারেন, তেমনি প্রয়োজন দেখা দিলে ফুঁৎকার দিয়ে সেই বিবাহ ভেঙ্গেও দিতে পারেন। তাই একদিন সাইদার অহম্মিকা ভাঙতে বদিউজাম্মান বিবাহ করলেও কিছুদিন পর ইকরাকে তালাক দিয়ে আবার মৌলাহাটে ফিরে এসেছিলেন।

আরবে ইসলাম ধর্ম প্রচারের সময় মুসলিম চুক্তিবদ্ধ বিবাহ আইন প্রয়োগ করে ইসলাম আধুনিকতার দাবি রেখেছিল। এই আইনে বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর সম্মতি গ্রহণের অধিকার সর্বাগ্রে। কিন্তু নারীর সেই অধিকারকে পুরুষ আপন ক্ষমতার বলে কিভাবে নিজেদের হস্তগত করেছে তার প্রমাণ পেয়েছি আমরা এই উপন্যাসের রুকুর জীবনের কাহিনীর মধ্য দিয়ে। একসময় বদিউজাম্মানের ছোটো পুত্র শফিউজাম্মানের সাথে রুকুর কিছুটা সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। দুই পরিবারের সম্মতিক্রমে দরিয়াবানুর দুই মেয়ে রোজি-রুকুর সাথে বদিউজাম্মানের দুই পুত্র নুরুজাম্মান এবং শফিউজাম্মানের বিবাহও স্থির হয়েছিল। কিন্তু বিবাহের দিনে বয়স কম হওয়ায় শফিউজাম্মানকে তার শিক্ষক লুকিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে দুই পরিবারে সিদ্ধান্তে বদিউজাম্মানের খ্যাপা-হাঁদা পুত্র মনিরুজাম্মানের সাথে রুকুর বিবাহ দেওয়া হয়। পরিণামে রুকুকে একজন অর্ধমৃত মানুষের সাথে মর্মান্তিক জীবন কাটানোর দায় বহন করে চলতে হয়। এইভাবে ইসলামি চুক্তিবদ্ধ আইনের অপব্যাখায় বলি হওয়া রুকুদের জীবনের নিদারুন বাস্তবতাকে আখ্যানে তুলে এনেছেন লেখক।

একজন ন্যালা-হাবা পুরুষের স্ত্রী হওয়ায় বিয়ের পর রুকু বেছে নিয়েছে উদাসীন নির্লিপ্ত জীবন। এটা ছাড়া তার আর অন্য উপায়ও নেই, কারণ-

> "যখন-তখন একটা জন্তুমানুষের কামার্ত আক্রমণ, এমন-কি রজস্বলা অবস্থাতেও রেহাই নেই। চোখ বুজে দাঁতে দাঁত চেপে রুকু তার অবশ শরীর রেখে পালিয়ে যায়—পালাতেই থাকে, দূরে—বহুদূরে। কিন্তু কোথায় যাবে? কার কাছেই বা তার এই মানসিক সফর? খালি মনে হয়, খোঁড়াপিরের দরগায় ভাঙা ফটকে কাঠমল্লিকার ফুলবতী গাছের কাছে উলটো মুখে দাঁড়িয়ে আছে কেউ। ভয় পেয়ে পিছু হটে ফিরে আসে নিজের শরীরে। বেইজ্জত শরীরের ভেতর ঘৃণা, ঘৃণা আর ঘৃণা! নিজের ওপর, সবকিছুর ওপর।..."[১০]

এই বিয়ে রুকুর জীবনকে অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে। ইসলামি বিবাহ আইনের এরকম প্রয়োগে রুকুর মতো অনেক মুসলিম নারীর জীবনকেই তছনছ করে দেয়। স্বয়ং ধর্ম ধ্বজাধারী পিরের বাড়িতেই ইসলাম ধর্মের বিধানকে এমন করে বিকৃত করা হয়।

আর এরাই ধর্মভিত্তিক মুসলিম সমাজ গড়তে গিয়ে ধর্মকে বিভ্রান্তির পাথরে আছাড় মারে।

আবুল বাশার তাঁর 'ফুলবউ'(১৯৮৮) উপন্যাসে মুসলিম সমাজ, এবং সেই সমাজে প্রচলিত 'বহুবিবাহ', 'এজিন', 'তালাক' প্রথা এবং তার ভয়াবহ ফলাফল আধুনিক মুসলিম নারীদের জীবনকে কতটা রক্তাক্ত করে তার এক বাস্তব চিত্রকে তুলে এনেছেন। মেয়ে আর মাটির লড়াই যে কোনদিন শেষ হবে না হাজি নিসার হোসেনের এই উক্তির বাস্তব সত্যতা 'ফুলবউ' উপন্যাসের রন্ধে রন্ধে গাঁথা রয়েছে। আর সেই লড়াইটা শুরু করেছিলেন সীতাহাটির হাজি নিসার হোসেন, ষোড়শী সুন্দরী রাজিয়াকে চতুর্থ স্ত্রী রুপে ঘরে নিয়ে আসার বাসনার মধ্য দিয়ে। ইসলামি আইন চার স্ত্রী রাখার অনুমতি দিলেও মিল্লাত, নবীনার মতো সভ্য মন পিতার এমন অশ্লীল যৌনাকাঙ্ক্ষাকে প্রশয় দিতে পারেনা। আবার সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তিশালী হাজি সাহেবের এরকম কুৎসিত বিবাহ আটকানোর মতো ক্ষমতাও মিল্লাত, নবীনাদের নেই। তাই মিল্লাতকে সব কিছু ছেড়ে চলে যেতে হয় তার 'নিজস্ব সভ্যতায়'। আর নবীনাকে সাক্ষী হতে হয় এক ষোড়শী শিক্ষিতা যুবতির মানসিক যন্ত্রণার। মুসলিম সমাজের এই পরিচিত ছবি আর সভ্য শিক্ষিত মানুষদের মানসিক যন্ত্রণার ইতিহাসকেই লেখক নিয়ে এসেছেন মিল্লাত আর তার পিতার জীবনযাপনের সংঘাতের মধ্য দিয়ে।

সীতাহাটির মুসলিম পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধি হাজি নিসার হোসেন আর্থিক ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে বাড়িতে তিন স্ত্রী বর্তমান রেখেও চতুর্থ বিবাহ করার জন্য পাগলামি শুরু করে। আর নিজের এমন কদর্য যৌনবাসনার ছাড়পত্রও লাভ করতে পারে সমাজের কাছে, পরিবারের কাছে নবীর 'সুন্নত' পূরণের তারিকা দেখিয়ে। নিসার হোসেনের কাছে মনের সুখ বলে কিছু নেই, দেহের সুখই তার কাছে প্রধান। তাই ধর্মের বিধানকে কাজে লাগিয়ে, নারীদের আর্থিক নিরাপত্তাহীনতার সুযোগ নিয়ে পূর্ব স্ত্রীদের মন নামক বস্তুকে পিষে ফেলে আদায় করে নিতে পারেন একাধিক বিবাহের অনুমতিও। নিসার হোসেনদের এমন ইচ্ছা পূরণ করতে ধর্মের চাবুক কতখানি সহায়ক তার বাস্তব চিত্র ধরা পড়েছে এই উপন্যাসে চতুর্থ বিবাহের আগে প্রথমা স্ত্রীর কাছে অনুমতি নেওয়ার মাধ্যমে।–

"নিসার হোসেন প্রথম মাবুদকে দিয়ে বড়গিন্নির কাছে তাঁর চতুর্থ বিবাহের সদিচ্ছা প্রকাশ করলেন। কারণ আরও দুটি বিবাহ তিনি এইভাবেই প্রথমা পত্নীর স্বীকৃতি নিয়েই সম্পন্ন করেছেন। এ-ক্ষেত্রে না-করার মতন সাহস প্রথমা পত্নীর নেই। কখনও কোন পত্নীরই কি থাকে? নবীর সুন্নতে হস্তক্ষেপ করার ধর্ম-বিরুদ্ধ মনস্কামনা থাকতে নেই কুত্রাপি।"[১১]

নিসার হোসেন জানেন পূর্ব স্ত্রীদের কোনও বাঁধায় তার কাছে ধোপে টিকবে না, তবুও প্রথমা স্ত্রীর কাছে কিছুটা প্রশয় চাইছেন যাতে পরিবারের অন্য কেউ প্রতিবাদ করতে না পারে। কিন্তু নিসার হোসেনের এক পক্ষের কন্যা নবীনা এবং অন্য আর এক পক্ষের পুত্র মিল্লাতের কাছে এই বিবাহের কদর্যতা ধরা পড়েছে। মিল্লাত পিতার এমন বিবাহের সিদ্ধান্তে ক্রুদ্ধ অপমান আর গ্লানি নিয়ে শহরে গিয়ে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে নিজস্ব জগতে, পারে না কেবল নবীনা। পুথিগত শিক্ষা তার কম হলেও চিন্তা চেতনার স্তর নিসার হোসেনের পরিবারে ভীষণ বেমানান। তাই একমাত্র নবীনার চেতনাতেই ধরা পড়ে এই বিবাহ আসলে ধর্মের অজুহাতে একটি ষোড়শী দেহ ভোগের আয়োজন। জীবনের অভিজ্ঞতা ও যুগের ধর্ম দিয়ে সে বুঝেছে যে, এই আধুনিক যুগে বসে কোনও পুরুষের চারটে বিবাহ চলতে পারেনা। তাই পিতার সাথে কোরান হাদিসের ব্যাখ্যা নিয়ে সে তর্ক করে। হাজি নিসার হোসেনকে সে বলে, "আমি নিজেই জানি, এ-যুগে চারটি বিয়ে কিছুতেই চলে না। একা একটি মানুষ চার চারটি মনকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। সেটা অসম্ভব।"[১২] হাদিস অনুযায়ী বহুবিবাহ করা কখনও সম্ভব নয়। অথচ আধুনিক যুগে বসেও নিসার হোসেনের মতো পুরুষরা এমন বিবাহের বৈধতা দিব্যি পেয়ে যায়।

নিসার হোসেনের মতো আর্থিক প্রতিপত্তিশালী হাজি সাহেবের এরকম বিবাহে নবীনার মতো মেয়েদের যুক্তি বাঁধ সাধতে পারেনা। তাই ইসলামি পিতৃতন্ত্রের দাপট দেখিয়ে বৃদ্ধ নিসার হোসেন ষোড়শী শিক্ষিতা রাজিয়াকে তার অমতেই বিয়ে করেছিল। কিন্তু "সেই বিয়েতে যে মেয়ের কষ্ট হয় না, নবীর কৃপায় তেমন মেয়ের আকাল হয়নি।"[১৩] রাজিয়া এই বিয়েতে সমাজের বাহ্যিক চাপে মুখের সম্মতি দিলেও অন্তরের সায় ছিল না। ইসলামি চুক্তিবদ্ধ আইন অনুযায়ী এরকম বিবাহ অবৈধ।

মুসলিম ধর্মের ধ্বজাধারীরা সমাজে এমন অবৈধ বিবাহের বিরুদ্ধে মুখ খোলেন না। অথচ যখন একজন বৃদ্ধের সঙ্গে যৌনসম্পর্ক গড়তে পারেনা রাজিয়ার মতো মেয়েরা, তখন এরাই আবার ধর্মীয় বিধানে পাপী বলে তকমা এঁটে দেয় তাঁদের। মনের অস্মমতি থাকলেও একটা কলমার জোরে সমাজে রাজিয়ার স্বামীর পদ মর্যাদা লাভ করে নিসার হোসেনরা। আর সমাজ স্বীকৃত সেই পদে বসে নিজের যৌন আকাঙ্খা পূরণ করতে না পারলে ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী লাভ করতে পারেন নারীকে প্রহার করার সুযোগ। নিসার হোসেনও সেজন্য রাজিয়ার এমন অবাধ্যতার উপযুক্ত শিক্ষা দিতে তার কনুই জলন্ত আগুনে চেপে ধরে পুড়িয়ে দিয়েছিল।

রাজিয়া তাই এরকম বিয়ে থেকে মুক্তি লাভ করে চেয়েছিল স্বাভাবিক একটা জীবন। সেই জীবন শুরু করার জন্য স্বামীর কাছ থেকে বিবাহবিচ্ছেদ নেওয়া অপরিহার্য ছিল। কিন্তু যেখানে তার বিবাহবন্ধনই নিজের ইচ্ছায় ঘটেনি, তালাক তো সেখানে তাঁর অধিকারের সম্পূর্ণ বাইরে। বিবাহ, তালাক সংক্রান্ত অধিকার ইসলামি আইনে মুসলিম মেয়েদের থাকলেও তা কেবল কোরান, হাদিসেই সীমাবদ্ধ। তাই রাজিয়ার মতো বাঙালি মুসলিম নারীদের সেই অধিকার ভিক্ষা করে ফিরতে হয়। হাজি নিসার হোসেনের কাছ থেকে তালাক আদায় করতে না পেরে রাজিয়ার দাদারা জোর করে ভয় দেখিয়ে তালাকনামায় সই করিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু রাজিয়া চেয়েছিল সমাজের কাছে তালাক পাওয়া মুক্ত নারী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। তাই স্বামীর মৃত্যুর সময় সকলের সামনে চেয়েছিল খালাস লাভ করতে। খালাস এবং তালাক দুটির তফাৎ লেখক হাতুড়ে ডাক্তার মবিনের মুখ দিয়ে শুনিয়েছেন—

> "...তালাক হল, বিচ্ছিন্ন হওয়া। সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়া। আর খালাস হল, সম্পর্ককে মেনে নিয়েই মুক্তি দাবি করা।... খালাস ইহলৌকিক মুক্তি। পারলৌকিক বিচ্ছেদ নয়। তালাক কিন্তু ইহলোক পরলোক সবখান থেকে বিচ্ছেদ। চির বিচ্ছেদ।"[১৪]

রাজিয়া ইহলৌকিক পরলৌকিক কোনও মুক্তিই পায়নি। মৌখিক তালাক না পেয়ে রাজিয়া মৃত্যু পথযাত্রী নিসারের কাছ থেকে খালাস পাওয়ার আকুতি নিয়ে গিয়েছিল। রাজিয়ার শরীরকে ভোগ করতে

না পারার বেদনায় নিসার হোসেন মৃত্যুর সময়ও রাজিয়ার জন্য রেখে গিয়েছিল অভিশাপের অন্তিম কামড়-

> "খালাস নাই। দিমু না মুই। না রে নাঃ দিব না। সেই রাতে যা দিলি নে মালকিন, সেই ভুখ নিয়ে মরলাম, আল্লাজী তোর কসুর যেন মাফ না দ্যান, এই মোনাজাত। পুলসেরাত তোকে কে পার করে, দেখব একবার। তুই খালাস পাবি না।"[১৫]

এরপরই রাজিয়ার জীবনে শুরু হয় ট্র্যাজেডির নতুন অধ্যায়। নিসারের কাছ থেকে খালাস না পেয়ে রাজিয়া নিসার হোসেনের শহরের বাড়িতে গিয়ে উঠেছিল। এই বাড়ি বিবাহের সময় রাজিয়া দেনমোহর স্বরূপ নিসারের কাছ থেকে যৌতূক হিসাবে পেয়েছিল। সেখানে নিসার হোসেনের পুত্র মিল্লাতের সাথে তার দেখা হয়, যে মিল্লাতের সাথে একসময় রাজিয়ার বিবাহের কথা হয়েছিল। যৌতূক স্বরূপ পাওয়া এই বাড়িই রাজিয়ার জীবনে কৌতুকে পরিণত হয়েছিল। কারণ নিসার আগে থেকেই শহরের এই বাড়িতে বসবাসকারী পুত্র মিল্লাতের নামে তার দলিল করে রেখেছিল। তাই দ্বিতীয়বার রাজিয়াকে দেনমোহর স্বরূপ দিলেও তা গ্রাহ্য হবেনা। রাজিয়া বা মিল্লাত কারও একথা জানা ছিল না। নবীনার মাধ্যমে মবিন সেকথা জানতে পেরে মিল্লাতকে যখন আশ্বস্ত করে তখন পুরুষ তন্ত্রের প্রতারণার ছবি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। "...তুমি বঞ্চিত হবে না। ফাঁকি মেকি চালাকির ফরমূলা মেয়েদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। রাজিয়া বোল্ড আউট হলে চোখের পানি ফেলার লোকও সীতাহাটিতে খুঁজে পাওয়া যাবে না।"[১৬] রাজিয়ার জীবনে মবিনের এই ভবিষ্যৎ বানী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছিল।

আবুল বাশারের 'ফুলবউ' উপন্যাসের নায়িকা রাজিয়া নিসার হোসেনকে বিবাহ করার আগে থেকেই মিল্লাতকে অন্তরে একদিন গ্রহন করেছিল। ষোড়শী যুবতির মন একবার যে পুরুষকে ভালোবেসে সিজদা করে ফেলে, সমাজ বা সংসারের কোনও নিয়মই সেই প্রেমকে মুছে ফেলতে পারে না। নিসার হোসেনের যৌন তাড়না সেই প্রেমকে মাতা পুত্রের সম্পর্কে নামিয়ে আনলেও ছাই চাপা আগুনের মতো সেই প্রেম কেবল সুপ্ত ছিল। ইতালির ক্ল্যাসিক কবি ওভিদের 'Heroides' কাব্যের 'হিপ্পোলিটাসের প্রতি ফ্রিডা' পত্রিকায় দেখা যায় ফ্রিডা গোপনে ভালোবেসেছিল সপত্নী পুত্র হিপ্পোলিটাসকে।

আবুল বাশারের রাজিয়াও একদিন যাকে অন্তরে গ্রহন করেছিল, পুত্রসম হলেও ঘটনাচক্রে সেই প্রেমকে সুপ্ত রাখতে পারেনি। সোমের প্রতি তারার প্রেমকে মধুসূদন যেমন সত্যতা ও সৌন্দর্য দান করেছিলেন। তেমনি আবুল বাশারও মিল্লাতের প্রতি রাজিয়ার প্রেমকে শুধু সত্যতা দেননি, রিয়াজের মতো মানসপুত্রকে হাজির করলেন সেই প্রেমের বৈধতা প্রমাণ করতে। রিয়াজকে দিয়ে লেখক আবিস্কার করালেন, "তোমাদের সম্পর্কে কোথাও কালিমা নেই। আমি নবী হলে তোমাদের বিয়ে দিতাম। মুসলমানের বিয়ে কলেমার বিয়ে নয়। অর্থাৎ মন্ত্র পড়া বিয়ে নয়। সেটা একটা সামাজিক চুক্তি। মেয়ের পূর্ণ 'এজিন' মানে সম্মতি ছাড়া বিয়ে হয় না। হাজীর সাথে তোমার বিয়েটা ছিল অত্যন্ত কুৎসিত। অবৈধ।"[১৭] রিয়াজ হাদিস কোরানের ব্যাখ্যা তুলে প্রমাণ করলেন এই বিয়ে ইসলাম ধর্ম সম্মত নয়। তাই রাজিয়া- মিল্লাতের সম্পর্কের স্বাভাবিক পরিণতি দানের উদ্যোগ নিতে মুসলিম সমাজের দারস্ত হতে হল। শহরের বিখ্যাত আকবর মৌলবির কাছে রিয়াজ হাদিস ব্যাখ্যা করে এই বিবাহের অবৈধতা প্রমাণ করলেও আকবরজী তাঁর এই যুক্তিকে নস্যাৎ করে দিয়ে বর্ণনা করলেন ফেকাহ হাদিস- "...কামপরবশ হয়ে যে স্ত্রীর গোপন অঙ্গে দৃষ্টি করা হয়েছে তার মাতা, মাতামহী, পিতামহী, কন্যা, দৌহিত্র, কাউকেই বিয়ে করা চলবে না। তারা প্রত্যেকে অবৈধ।"[১৮] যৌন সম্পর্ক না হলেও রাজিয়া যেহেতু মিল্লাতের পিতার কাম দৃষ্টিতে বিদ্ধ, তাই তাদের এই বিবাহের স্বীকৃতি মুসলিম পিতৃতন্ত্র দেয় না। আকবরের যুক্তি এই বৃদ্ধই বেহেস্তে গিয়ে রাজিয়ার বাইশ বছরের যুবক প্রেমিক হয়ে উঠবে।

বাস্তববাদী রাজিয়া বেহেস্তের কাল্পনিক সুখ পেতে ছায় না। সে চায় মাটির পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে বাস্তব প্রেম পেতে। তাই তাঁর মনষ্কামনা ঈশ্বর যদি কখনও তাকে একটি পুরস্কার ঘোষণা করেন, তবে সে মিল্লাতকে চেয়ে নিয়েই পাপের সুখ অনুভব করবে। কিন্তু পাপ-পুণ্য কোনও সুখ ভোগের আধিকারই ইসলামি বিধি তাঁকে দেয়নি। তাই সমাজে স্বামীর কাছ থেকে খালাস না পাওয়া রাজিয়ারা নামাজ পড়লেও পাপী, কারণ সে স্বামীর ইচ্ছা পূরণ করেনি। মিল্লাতকে ভালোবেসে পাপের সুখ অনুভব করতে চাইলেও সে পাপী।

রিয়াজ তাদের ভালবাসাকে সমাজে স্বীকৃতি দিতে চাইলেও মবিনদের মতো সমাজের মানুষ তার সুযোগ রাখে না। তাই রাজিয়া-মিল্লাতের বিবাহ ঠিক করেও সঠিক সময়ে রিয়াজ গকুল মৌলবিকে খুঁজে পায় না। নিসার, আকবর, মবিনদের মতো ধার্মিক সমাজ রাজিয়াদের জন্য কোনও রকম মুক্তির পথই খোলা রাখে না। যে বিদ্রোহী ব্যক্তিত্ব নিয়ে রাজিয়া একদিন মিল্লাতকে ভালোবেসে পেতে চেয়েছিল, সেই সত্ত্বাও ধর্মীয় বিধানের করাল ছোবল খেতে খেতে শেষঅবধি সমাজ থেকে পালিয়ে গেছে।

নিসার হোসেনের প্রথম পক্ষের কন্যা নবীনা এই উপন্যাসে আর একজন মুসলিম নারীর প্রতিনিধি। লেখক তার মানসিক যন্ত্রণাকে একটু অন্য ভাবে দেখালেও রাজিয়ার সাথে তা অনেকটাই মিল আছে। নবীনা একসময় মবিনকে ভালবাসলেও বিয়ে হয়েছিল সাদিকের সাথে। কিন্তু সেই বিয়ে সুখের হয়নি। নবীনা তাই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল মবিনের সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে। নবীনাই মবিনকে প্রথম শিখিয়েছিল যৌনবিদ্যা। মবিনের সাথে সম্পর্কেও বিশ্বাস হারিয়েছিল নবীনা। পিতা হাজি নিসার হোসেন তাকে সতীন সুখ ভোগ করার যে অভিশাপ একদিন দিয়েছিল, সেই অভিশাপের সুযোগ নিয়ে সাদিক দ্বিতীয় বিয়ে করে তা বাস্তবায়িত করেছিল। রাজিয়ার মতো নবীনা সাদিকের কাছ থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিল। রিয়াজ বুঝেছিল সাদিক মৌখিক তালাক না দিলে নবীনা কোথাও বিয়ে করতে পারবে না। আসলে রিয়াজ নবীনাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু হাদিস অনুযায়ী ‘পরস্ত্রীকে বিয়ে করা পাপ’। সমাজের এই ফতোয়ার বিরুদ্ধে ক্রোধ প্রকাশ করে রিয়াজ ডায়েরির পাতায় পরস্ত্রী শব্দের চারিদিকে লাল বৃত্ত দিয়ে দাগ দিয়েছিল। আর নবীনা রিয়াজের এই ডায়েরির পাতায় পরস্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম এই শব্দে দাগ দেওয়া দেখে অসহায় হয়ে পড়েছিল। তার চোখে নিসার, মবিন, সাদিক, এর মতো রিয়াজের একই রূপ ধরা পড়েছিল। তাই নবীনা বুকে হালকা চিনচিনে ব্যাথা নিয়ে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবন থেকে মুক্তি লাভ করে।

ধর্মীয় বিধানে যন্ত্রণাকাতর মুসলিম নারীর বাস্তব জীবনের কাহিনী তুলে ধরতে লেখক রাজিয়া, নবীনাদের আখ্যানের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছেন। কাহিনীর শুরুতে দুই নারীর যে বিদ্রোহী ব্যক্তিত্ব দেখা

গিয়েছিল, ধর্মীয় বিধানের করাল গ্রাসে শেষ অবধি তা অন্য মোড় নিয়েছে। মুসলিম পিতৃতন্ত্র রচিত একপেশে ধর্মীয় বিধানের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে লেখক রিয়াজকে মুসলিম সমাজ সংস্কারক হিসাবে দাঁড় করাতে চাইলেন। কিন্তু যে সমাজের সংস্কার আন্দোলনে রিয়াজকে লেখক নিয়ে এসেছেন সেই সমাজকে একচুলও নড়াতে পারেন নি। নিসার হোসেন, মবিন, সাদিক, আকবর দের মতো মানুষ যে সমাজের রাশ ধরে বসে আছেন, সেই সমাজের রথের চাকাকে রিয়াজের মতো চিন্তা চেতনার গুটিকতক মানুষের পক্ষে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই সেই সমাজে রাজিয়া, নবীনাদের মতো মেয়েদের মুক্তির অন্য পথ খুঁজে নিতে হয়। রাজিয়া তাই সেই সমাজের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছে, "...কিসের সভ্যতা আপনাদের? যা প্রাগৈতিহাসিক, ট্রাইবাল, পুরনো, সেইসব? নিসারের সম্পত্তি বলেই আমি মিল্লাতের সম্পত্তি হতে পারি না। আমি কারোর নই। আমি আমার।"[১৯]

রাজিয়া জানে নিসার হোসেন, মিল্লাত, মবিন, রিয়াজ, এরা কেউই তাদের মুক্তি দিতে পারবে না। এই সমাজে মবিনদের মতো পুরুষরা নিসারের থেকে রাজিয়াকে মুক্ত করে প্রেমের স্বাভাবিক পরিণতি দিতে পারেনা। অথচ মা ও মেয়েকে সমান ইচ্ছায় ভোগ করতে পারে, সেই মানুষটা তারপর আবার সমাজের ভয় দেখায়। খোদার দরবারে এমন মানুষদের কি বিচার হবে রাজিয়ার জানা নেই। তাই বাস্তবের মাটিতে রাজিয়া মুসলিম নারীদের মুক্তির পথ খুঁজতে সমাজ থেকে দূরে সরে গিয়ে আরও অনেক রাজিয়াদের সন্ধানে বেরিয়েছে, যারা একদিন নিজেদের উপযুক্ত প্রস্তুত করে এই সমাজের মুখোমুখি এসে দাঁড়াবে।

মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের সুযোগ নিয়ে নারীদের উপর পিতৃতন্ত্রের দাপট কেবল ধর্মপ্রাণ মৌলবাদীরা দেখায় তা নয়। তথাকথিত সভ্য যুক্তিবাদী রুচিশীল ব্যক্তিরাও যে এই আইনের আশ্রয় নিয়ে মুসলিম নারীর জীবনকে ছিন্ন করে দেয় তার পরিচয় দিয়েছেন আবুল বাশার 'ধর্মের গ্রহণ' (১৯৯২) উপন্যাসে। এই আখ্যানের কহিনীতে আমরা দেখতে পায় দশ পারার হাফেজ (কোরানের দশটি অধ্যায় মুখস্থ) নাজনিনের সাথে বিয়ে হয় শিক্ষিত নাস্তিক বেলালের।

বিয়ের পরেই শুরু হয় জীবনের সাথে ধর্মের সংঘর্ষ। নাজনিন নিজেকে কোরানের প্রতিটি শব্দের মতোই পবিত্র মনে করে। তাই অধার্মিক অশুদ্ধ বেলালের তাকে স্পর্শ করার অধিকার সে দেয় না। মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে ধার্মিক নাজনিনের এই অহংকারকে বেলাল মেনে নিতে পারেনা। একদিন তাই নাজনিনের শুদ্ধতার গোপন ঘাতক হয়ে নির্জন দুপুরে জোর করে মিলিত হয় বেলাল। নাজনিনের প্রতি আকর্ষণের টানে রুচিশীল বেলাল একসময় নাজনিনের সংস্কৃতি কে মেনে নেয়। কিন্তু এরপরই শুরু হয় তার মানসিক যন্ত্রণা। একদিকে ধর্মচারনের জন্য স্ত্রীর চাপ, অন্যদিকে হাফেজ সমিউল্লার প্রতি নাজনিনের আচরণ তার মনে সন্দেহের দানা বাঁধে।

অন্যদিকে নাজনিনের পরিবর্তনীয় সত্ত্বা অনুভব করে "...ধর্মের সকল নীতি জীবনের সমগ্রকে বাঁধতে পারেনা। জীবন যেমন ধর্মের সমান, তেমনই ধর্মের অতিরিক্ত।"[২০] কিন্তু নাজনিনের এই পরিবর্তনকে বুঝে ওঠার আগেই বেলাল তাকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। সে মনে করে হাফিজ সমিউল্লাহ আর নাজনিন একই সুরে বাঁধা। তাই নাজনিনের মতামতের কোনও অবকাশ না নিয়েই ক্ষমতাশীল পুরুষতন্ত্রের দাপট দেখিয়ে নাজনিনকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে বেলাল। মিথ্যা সন্দেহে সমিউল্লাহকে নাজ (স্ত্রী) উপহার দেওয়ার উদারতা দেখিয়ে নামাজ পড়ে জায়নামাজে (নামাজ পড়ার আসন) বসেই নাজনিনকে তালাক দেয় বেলাল। যুক্তিশীল বেলালও 'তালাক' শব্দের সুযোগ নিয়ে নাজনিনকে বিপর্যস্ত করল। নাজনিনের কাতর আবেদনেও সে সাড়া দেয়নি। একসময় নাজনিন সমিউল্লাহ কে লুঙ্গি গেঞ্জি উপহার দিয়েছিল। বেলালের তরফ থেকেও লুঙ্গি গেঞ্জির মতো নাজনিনকে উপহার হিসাবে তুলে দেওয়া হল সমিউল্লাহের সামনে। যে বেলাল রেডিক্যাল মেহাম্যাডানদের জন্য ক্লাব তৈরি করেছিল, নজরুল সমিতি চালাত, সেই নাস্তিক বেলাল সুবিধামতো মুসলিম পিতৃতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করল। নাজনিনের প্রতি আকর্ষণের টানে বেলাল নাজনিনের ধর্মপালনের সংস্কৃতিকে মেনে নিয়েছিল ঠিকই কিন্তু কিছুদিন পর ক্লান্ত হয়ে আবার নিজের জগতে ঢুকে পড়েছিল। যে বেলাল মানুষের কাছে ধর্মপালনের অজুহাত দেখিয়ে ভন্ডামি করতে পারেনা তার কাছ থেকে তালাক শব্দের প্রয়োগ আশা করা যায় না।

আসলে ইসলামি আইন মুসলিম পুরুষদের হাতে মুসলিম নারীদের দমন করার যে ক্ষমতা অর্পণ করেছে সমাজে বেলালের মতো রুচিশীল পুরুষরাও প্রয়োজন পড়লে কখনো সেই আইনের হুঙ্কারে নারীদের কতটা বিপর্যস্ত করতে পারে তারই চিত্র লেখক এই আখ্যানে দেখিয়েছেন।

কিন্তু নাজনিন এ তালাক মেনে নেয়নি। সে তার নানিকে জানায় "আমি আদেও তালাক হয়েছি কিনা বলতে পারিনা।"[২১] সে না মেনে নিলেও বেলাল তালাক শব্দটির প্রয়োগ করেছে আবেগের বশবর্তী হয়ে। তাই নাজনিন বেলালের কাছে ফিরতে চাইলেও "...বেলাল তাকে আর গ্রহণ করবে না; যে কুৎসিত পথে তাকে ফিরতে হবে, অন্যের সঙ্গে বিবাহ, তালাক এবং বিবাহ, এ পথ সে মাড়াতে পারবে না।"[২২] ধার্মিক নাজনিনের মতো মেয়ে নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছে এই নোংরা আইনকে। তাই লেখক দশপারার হাফেজ নাজনিনের মুখ দিয়ে এই কুৎসিত আইনের বিরুদ্ধে আঘাত করেছেন। বেলালের কাছে নাজনিন ফিরতে চাইলে তাকে তিনমাস পর অন্য একজন পুরুষকে বিবাহ করতে হবে। সেই পুরুষের সাথে কমপক্ষে একরাত্রি কাটিয়ে, যৌনসম্পর্ক করে, তবে সে নিজেকে পবিত্র বলে প্রমাণ করতে পারবে। তারপর সেই পুরুষ তালাক দিলে, পুনরায় নতুন করে বিয়ে করে বেলালের কাছে ফিরতে পারবে। তালাক নেওয়া, রোধ করা বা পুনরায় ফিরে যাওয়ার কোনও পথই মুসলিম নারীর জন্য সম্মানের নয়। নাজনিনের পক্ষে এমন অসম্মানের পথ মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তাই তালাক প্রাপ্তা ধার্মিক নাজনিনও একসময় এই একটি শব্দকে তুচ্ছ করে বেলালকে বলে, "আমাকে ক্ষমা কর মুনশী। আমাকে রাখো।"[২৩] ততদিনে বেলালও উপলব্ধি করেছে একটি মিথ্যা শব্দ ব্যবহার করে সে নাজনিনকে ছিন্ন করে দিয়েছে। তার কাছেও শেষ পর্যন্ত এই শব্দটির অসারতা প্রমাণ হয়ে গেছে। তাই বেলাল সবশেষে জানিয়েছে "না যাবে না! এইখানেই থাকবে।"[২৪] জীবনের দাবির কাছে ধর্মের এরকম মূল্যহীন ফতোয়া তুচ্ছ হয়ে উভয়ের জীবনকে মসৃন করেছে। কোনও অসম্মানের পথ পেরিয়ে নাজনিনকে আসতে হয়নি। নতুন বোধে, নতুন চেতনায়, লেখক দাম্পত্য জীবনে বিবাদ কলহের সুযোগে ঢুকে পড়া তালাক শব্দটিকে মূল্যহীন প্রমান করেছেন।

আফসার আমেদের 'আত্মপরিচয়'(১৯৯০) উপন্যাসে মুসলিম সমাজের নারীর পারিবারিক অবস্থান, তাদের জীবনের মর্মান্তিক কাহিনি, এবং তা থেকে উত্তরণের মাধ্যমে নিজেদের পৃথক পরিচয় খোঁজার মধ্য দিয়ে আখ্যানের কাহিনী গড়ে উঠেছে। রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের নারীদের প্রকৃত অবস্থানের চিত্র লেখক তুলে এনেছেন হাজিবাড়ির দুই বউ সায়েরা এবং মালেকার মধ্য দিয়ে।

মালেকা চরিত্রটির মাধ্যমে দেখানো হয়েছে মুসলিম ব্যক্তিগত আইনে বিবাহবিচ্ছেদের জটিলতা। রুচিশীল, শিক্ষিতা মালেকার আত্মজাগরনের পথ শুরু হয় হাজিবাড়ির সেজবউ সায়েরার মর্মান্তিক পরিণতির পর থেকে। রক্ষণশীল হাজিবাড়ির কোঠর নিয়ম কানুন ভঙ্গ করার অপরাধে সেজবউ সায়েরাকে নৃশংসভাবে খুন করে হাজিবাড়ির মেজো ছেলে জালাল। হাজি-পরিবারের সকলের নিরব সমর্থন লক্ষ্য করে মালেকা। শুধু সায়েরার স্বামী কামালের কাছে এই হত্যার কথা গোপন রাখা হয়। বলা হয় সায়েরা সিঁড়ি থেকে পড়ে মারা গেছে। তিন সন্তানের জননী মালেকা এতদিন চুপচাপ হাজিবড়ির সব নিয়ম কানুন মেনে চলেছিল। সেজবউ সায়েরার এরকম মর্মান্তিক পরিণতি দেখে তার মনের সুপ্ত বিদ্রোহী সত্তা জেগে ওঠে। ভেতরে ভেতরে হাজিবাড়ির বিরুদ্ধে তার ক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করে। স্বামী আলাল কে নিয়ে এই বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে চেয়েছিল মালেকা। কিন্তু মালেকার এই পরিবর্তন, হাজিবাড়ির নিয়ম নীতি ভঙ্গকরার এই ঔধত্যকে প্রশয় দিতে পারে না তার স্কুল শিক্ষক স্বামী আলাল। আসলে মালেকা চেয়েছিল তার স্বামী, সন্তানদের হাজিবাড়ির এরকম আচ্ছন্ন সংস্কার থেকে মুক্ত করে প্রকৃত জ্ঞানের আলো দেখাতে। আর অন্যদিকে হাজিবাড়ির নিজস্ব নিয়ম নীতি বজায় রাখতে আলাল মালেকার এই পরিবর্তনকে কোঠর হাতে দমন করার চেষ্টা করে যায়। মালেকার উপর আলাল মানসিক, শারীরিক অত্যাচার শুরু করে। তাই মালেকা হাজিবাড়ির দুষিত, অমানবিক পরিবেশ থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজতে থাকে। আর্থিক নিরাপত্তার কথা ভেবে আলালের কাছে থেকে তালাক নেওয়ার জন্য নিজেকে পুরোপুরি তৈরি করতে পারেনা। এই মানসিক অস্থিরতার সময় হাজিবাড়িতে নিয়মিত আসা পত্রিকার খবর থেকে সে জানতে পারে- "দেশে একটা গুরতর ঘটনা ঘটে গেছে। শাহবানু মামলা।

সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে ভরণপোষণ দিতে হবে। এই রায় নিয়ে হাজিবাড়িতে সুপ্রিমকোর্টের বিরুদ্ধে এক অসন্তোষ জমা হয়েছে। এ নিয়ে হাজি সাহেব, মৌলবি, সাজাহান মাস্টার, আসাদ চাচা, জয়নাল চাচা সরব আলোচনা করে চলেছে। এ ধরনের রায় ঠিক নয়। মুসলিম শরিয়তি আইনকে অবমাননা করা হচ্ছে। মুসলমানদের ধর্মগত ব্যক্তিগত আইনের শুদ্ধতা তাতে নষ্ট হতে বাধ্য।"[২৫] এই রায় মালেকার মনে সাহস সঞ্চয় করে। মুসলিম মেয়েদের জীবনে এমন রায়ের প্রয়োজনীয়তা নিজের জীবন দিয়ে অনুভব করে মালেকা। খোরপোষের নিরাপত্তা আলালের বিরুদ্ধে, হাজিবাড়ির বিরুদ্ধে মামলা করার শক্তি জোগায়।

মালেকা জানে আলাল তাকে সহজে মুক্তি দিয়ে খোরপোষ দেবে না। আবার এমন মানুষের সাথে জীবন কাটানোও তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। তাই মালেকা ভাবে- "একবারেই কুকুরের মত ভীত হয়ে পায়ের তলায় সব নিজস্বতা বিসর্জন দিয়ে থাকার যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবে সে।"[২৬]

তাই এই রায়ের জোরেই আলালের অমানবিকতা ও প্রেমহীন ভালোবাসা থেকে মুক্তি পেয়ে আত্মসম্মানের সঙ্গে বাঁচার মতো জীবন পাবে, পাবে আর্থিক নিরাপত্তা। অথচ মালেকা নিজের ধর্ম বিশ্বাস থেকে জানে সুপ্রিম কোর্টের এই রায় ইসলামি শরিয়ত বিরোধী। তা সত্ত্বেও যখন মানুষের জীবনের দাবির কাছে ধর্মের দাবি তুচ্ছ হয়ে যায় তখন কোঠর ধর্মবিশ্বাসী মনও চায় তার পরিবর্তন। বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে মুসলিম নারীর জীবনে ইসলামি আইনের এই বস্তুগত প্রয়োজনকে লেখক স্বাগত জানিয়েছেন মালেকার জীবন বোধ দিয়ে। সেই সঙ্গে আর্থিক নিরাপত্তা মুসলিম নারীর জীবনে কতটা প্রয়োজন তার পরিচয়ও পেয়েছি মালেকার মাধ্যমে। এতদিন মালেকা আর্থিক নিরাপত্তা কথা ভেবেই হাজিবাড়ির অন্যায় নিয়মকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। সুপ্রিমকোর্টের এই একটা রায় মালেকার জীবনের সেই ভিতকে নড়িয়ে দিয়েছে। মালেকার এই পরিবর্তন দেখে আলাল বুঝতে পারে শাহবানু মামলাই মালেকাকে এই সাহস যুগিয়েছে। বাড়ির বউ এর এই ঔদ্ধত্য পুরুষ হয়ে সে কিছুতেই মেনে নেবে না। তাই আলাল ঠিক করে "...তার বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেবে। নিয়ে আসবে না। গরিব মা বাবা। কতদিন টানবে?

খোরপোষের দাবি দাওয়া করলে সোজাসুজি তালাক। আর একটা বিয়ে করে নিতে পারবে।"[২৭] মুসলিম পুরুষদের স্ত্রীকে জব্দ করার খড়্গ স্বরূপ 'তালাক' অস্ত্রটিকে ইচ্ছামতো ব্যবহারের প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে আলালের এরকম ভাবনার মধ্য দিয়ে। এমনকি মালেকার সঙ্গে তার দন্ধের সীমা যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে তখনও নিজের পৌরষ রক্ষা করতে প্রতিহিন্সাপরায়ণ আলাল গর্জে ওঠে- "এখনো নুইবার সময় দিলাম, আর যদি বাড়স ত পুঁতে রেখে রাখব।...তালাকও দেব না, পাঠাবও না।"[২৮] স্বামী আলালের এরকম ভয়ংকর হুমকির প্রকাশে সেজবউ সায়েরার পরিণতির কথা ভেবে আঁতকে ওঠে মালেকা। তাই রাতের অন্ধকারে হাজিবাড়ি থেকে পালিয়ে যায় সে। কোর্টের সাহায্যে মামলা করে স্বামীর উপর প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ঠিক করে। কিন্তু ইতিমধ্যে মুসলিম ধর্মরক্ষক দের চাপে সুপ্রিম কোর্ট থেকে রায় বের হয় শরিয়তের পক্ষে। পার্লামেন্ট থেকে বিল পাশ হয় তালাক দিলেও খোরপোষ দিতে হবে না। সুপ্রিম কোর্টের এই রায় মালেকার মতো শত শত মুসলিম নারীর জীবনে বিষাদের অন্ধকার নিয়ে আসে। সংসদের মুসলিম নারী বিল ভেঙ্গে পড়লেও মালেকা চাইল কোর্টেরই সাহায্য নিতে। আর তাকে সাহায্যের জন্য লেখক নিয়ে এলেন জাভেদ উকিলের মতো যুক্তিশীল মানুষকে।

ইসলামি শরিয়তের একপেশে অন্ধতার বিরুদ্ধে প্রানপণ লড়াই করার মানসিকতা প্রকাশ পায় জাভেদ উকিলের চরিত্রে। তার আধুনিক যুক্তিবাদী মন শরিয়তি আইনের প্রকৃত উৎস খুঁজে তা পরিবর্তনে প্রয়াসী হয়ে ওঠে। মুসলমানদের ব্যক্তিগত আইন সম্পর্কে জাভেদ উকিলের বক্তব্য- "সকলে কিন্তু জানে মুসলমানদের ব্যক্তিগত আইন কোরান থেকে নেয়া। আসলে তা নয়। কোরানে মোট ৬০০০ বাক্য আছে, ব্যক্তিগত আইন সম্পর্কিত বাক্য মাত্র ৮০টি বাক্যে পাওয়া জায়-১২০টি বাক্যে এই আইনের ক্ষীণ ইঙ্গিত আছে।"[২৯] ধর্মের মাধ্যমে জীবনের সত্যকে জাভেদ উকিল মেনে নিয়েছেন। কিন্তু তিনি মেনে নিতে পারেন না ধর্মীয় মৌলবাদীদের নিজেদের প্রয়োজনে তৈরি করা মনগড়া আইনকে। তাই শরিয়ত সম্পর্কে তিনি বলেন- "শরীয়তের আইন হাদিসকে ভিত্তি করেই তৈরি হয়েছে। কিন্তু মুসলমান শাসকদের হস্তক্ষেপ আছে, ইচ্ছে মত হাদিস রচনায়। হজরত মহম্মদের মৃত্যুর ২৮০ বছর পর্যন্তও হাদিস রচনা হয়।"[৩০]

তাই ইসলামি শরিয়তকে কোঠর ভাবে মেনে নেওয়ার পক্ষপাতী জাভেদ উকিল নন। কারণ কোরানকেই একমাত্র উপজীব্য করে শরিয়তি আইন তৈরি হয়নি। এই আইন তৈরি হয়েছে বহুযুগ ধরে, ইসলামি শাসকদের ইচ্ছামতো নীতিগত বিশ্বাস দ্বারা সম্পৃক্ত হয়েছে শরিয়তি আইন। তাই জাভেদ উকিল এরকম শরিয়তি আইন সম্পর্কে আঘাত হেনে হাসানতকে বলেছেন- "এই শরীয়তী আইনেই স্ত্রী, স্বামীকে তালাক দেবার অধিকার পায়। কিন্তু কটা হতে দেখেছেন আপনি? নারীরও যৌন স্বাধীনতা আছে- কিন্তু তা কি হয়? কোরান হাদিস বাদ দিয়েও দুটি পথ অবলম্বন করে মুসলমান আইন তৈরি হয়েছে। এক 'ইজমা', দুই, 'কিয়াস'। কোরান হাদিসে সমাধান না পাওয়া গেলেও শাস্ত্রকারদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ হল 'ইজমা'। আর কিয়াস হল, কোরান হাদিস এবং 'ইজমা' দিয়ে সমাধান না হলে জ্ঞান বিবেক দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। 'কিয়াস'- এর জ্ঞান বিবেকের সহায়তায় ভারতের সুপ্রিম কোর্টের রায় ছিল শাহবানু মামলার ক্ষেত্রে।"[৩১] অথচ সুপ্রিম কোর্টের এই রায় ঘোষণার পরেই দেশ জুড়ে মুসলিম মৌলবাদীরা শরিয়তের শুদ্ধতার প্রশ্ন তুলে হৈ হৈ রব তুলেছিল। শেষ অবধি মৌলবাদীদের চাপে সুপ্রিম কোর্ট শরিয়তের পক্ষে রায় ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। সুপ্রিম কোর্টের এই রায় রাতারাতি মুসলিম নারীদের ভাগ্যাকাশে বিপর্যয় নামিয়ে এনেছিল। লেখক জাভেদ উকিলের মধ্য দিয়ে মুসলিম নারীর যন্ত্রণাকে প্রকাশ করেছেন। "তালাক প্রাপ্ত অসহায় নারীকে ভারণপোষণ না দিলে বিবেক আমাদের দংশন করবে না? পুরুষ তার খেয়ালে একটার পর একটা চারটে বিয়ে করবে, তারপর তালাক দিয়ে ইচ্ছেখুশি ছেড়েও দেবে। এই নারীরা অসহায় সহায়-সম্বলহীন হলে সমাজের উন্নতি হয় কি?"[৩২] জাভেদ উকিল মুসলিম সমাজের পরিবর্তনকামী একজন সমাজ প্রতিনিধি। ধর্মীয় মৌলবাদীদের এরকম অমানবিক বিধানের পক্ষে পার্লামেন্টের একপাক্ষিক বিল পাশ হওয়াতে অনেক সভ্য রুচিশীল মুসলিম সমাজের এক অংশ তা মেনে নিতে পারেনি। এরা চেয়েছিল সময়ের প্রেক্ষাপটে নতুন যুক্তিবোধ দিয়ে শরিয়তি আইনকে পেতে। জাভেদ উকিল সেই সমাজের প্রতিনিধি হয়ে মালেকার পক্ষ নিয়ে লড়াই করতে চেয়েছেন। কিন্তু মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের বাইরে গিয়ে মুসলিম নারীর ন্যায্য বিচার পাওয়ার ব্যবস্থা ভারতীয় সংবিধান তৈরি করেনি।

জাভেদ উকিল তাই মালেকাকে পরামর্শ দেয়- "আপনি ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৫ নং ধারা অনুসারে মামলা করতে পারেন স্বামীর বিরুদ্ধে। মনে রাখতে হবে আপনার স্বামী কিন্তু কোর্টের চোখে আসামি নয়।– আর আপনাকে যে কোন অবস্থাতে তালাক দেবার তার হক আছে। এমন কি আপনার অনুপস্থিতিতে মাতাল অবস্থায় তালাক দিতে পারেন।"[৩৩] জাভেদ উকিলের এই বক্তব্যতে স্পষ্ট হয়েছে ভারতীয় মুসলিম নারীদের অসহায় অবস্থার চিত্র। মালেকাও জানে হাজিবাড়ি থেকে তাকে তালাক বা খোরপোষ কোনোটাই দেবে না। তবুও মালেকা মনের জোর আর জাভেদ উকিলের সহায়তাকে পাথেয় করে আলালের বিরুদ্ধে 'নেকলেটেড ওয়াইফ' এই গ্রাউন্ডে মামলা করে। কয়েকটি বিষয়ে মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের পরিবর্তন করা মুসলিম সমাজের আধুনিকমনস্ক ব্যক্তিদের ভাবিয়ে তুলেছে। এই আখ্যানে লেখকের সেই নব ভাবনার দূত সমাজ সচেতন কয়েকজন মুসলিম নর-নারীর মধ্যে তৈরি হওয়া দন্ধ-সংঘাতের রূপটি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। এরা ধর্মের মধ্য দিয়েই ব্যক্তিগত আইনের পরিবর্তন চেয়েছে। মালেকা এবং জাভেদ উকিল দের মতো মানুষদের সেই প্রতিবাদের মাটিতে দাঁড় করিয়েই লেখক কাহিনির ইতি টেনেছেন। কারণ মুসলিম সমাজে এদের লড়াইটা দীর্ঘস্থায়ী, চাইলেই সবকিছু পরিবর্তন করা এত সহজে হবে না। আধুনিকতার ছোঁয়ায় শরিয়তের অনেক কিছুতেই বিশুদ্ধতা নষ্ট হচ্ছে, কিন্তু তাতে ধর্মরক্ষকদের তেমন কোনও আওয়াজ শোনা যায় না। কেবল মুসলিম নারীদের জীবনের স্বার্থে জড়িত কোনও বিধানের পরিবর্তন করার প্রশ্ন উঠলেই এরা নড়ে ওঠে। স্বার্থান্বেষী মুসলিম মৌলবাদীদের চরিত্রের এই সরূপ সম্পর্কে মালেকার মতো সচেতন হয়ে উঠেছে অনেক মুসলিম নারী। মালেকার মতো নারীদের এই জাগরণের চিত্রটি তুলে ধরে লেখক ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মুসলিম নারীদের আশার আলো দেখিয়েছেন।

আফসার আমেদের 'অন্তঃপুর' (১৯৯৩) উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে গ্রামীণ নিম্নবৃত্ত পরিবারের মুসলিম সমাজের নারীদের জীবনকে কেন্দ্র করে। এদের জীবন অন্তঃপুরের ঘেরাটোপের মধ্যেই আবদ্ধ, তাই পুরুষদের একটা বাহির থাকলেও এদের নেই। সকাল থেকে রাত অবধি এরা নিজেদের স্বামী-সন্তানদের আবর্তেই বেঁচে থাকে। কেবল উৎসবের দিন গুলিতে নিজেদের মতো করে আনন্দে মেতে ওঠে। আবার অন্তঃপুরের ঘেরাটোপে আবদ্ধ থাকে বলেই আত্মীয়স্বজন কারো মৃত্যুতে ছুটে আসে পরস্পরের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য। আর তখন নিজেদের অনেক অব্যক্ত যন্ত্রণাকে প্রকাশ করে পরস্পরের গলা জড়িয়ে ধরে কান্নার মধ্য দিয়ে।

> "নিজস্ব অনেক অপূর্ণতার কান্না এসে মেশে বলে এত তারা কাঁদে। নারীরা মিলিত, সম্মিলিত নারীদেরই সম্মিলিত কান্না। নারীদেরই গলা জড়িয়ে তখন এরা কাঁদে। সমব্যথায় মিলিত হয় যেন। পুরুষের মিলনে যেন সুখী নয়। এত কান্না পুরুষের গলা জড়িয়ে কোন নারীকে কাঁদতে দেখা যায়নি। সমব্যথিত হৃদয়ের উৎসব তারা তাই চায়। মৃত্যুতে, বাসরে, ধর্মীয় আসরে।"[৩৪]

মাতৃত্ব ও স্নেহে ভরপুর মুসলিম অন্তঃপুরের এই নারীরা জীবনের স্বাদ ভুলে, সৌন্দর্য ত্যাগ করে বেঁচে থাকে। কখনও আবার এরকম বেঁচে থাকার জীবনেও বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় স্বামীদের মন মস্তিস্ক। তখন নিজেদের অস্তিত্বটুকু টিকিয়ে রাখায় প্রধান সমস্যা হয়ে পড়ে। এই আখ্যানে জাহিরাও হারিয়ে ফেলে নিজের জীবনের অর্থ। স্বামীর সাথে সামান্য বিষয়ে মনমালিন্য হলেই কুকুরের মতো মার খায় জাহিরা। তাই একদিন সহ্যের সমস্ত সীমা অতিক্রম করলে রাগ করে বাপের বাড়ি চলে আসে। সেই ফাঁকে তার স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করে বসে। দ্বিতীয় বিয়ে করার পূর্বে প্রথমা স্ত্রীর অনুমতির কথা ইসলামি আইনে স্বীকৃত হলেও, এটা প্রহসনে পরিণত করেছে পুরুষরা। প্রথমা স্ত্রী আপত্তি করলেও স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ আটকায় না। জাহিরা স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের বিরোধিতা করতে বাপের বাড়ির আশ্রয়প্রাপ্ত যুবক মাসুদকে ভালোবেসেছিল।

কিন্তু তার আইনসম্মত স্বামী থাকায় সে ভালবাসা পরিণতি পায়নি। মাসুদের সাথে বিয়ে হয় চাচাতো বোন আসমার। বিয়ের পরও জাহিরা মাসুদের সাথে গোপন সম্পর্ক রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু দাদিমা মরিয়মের বিরোধিতায় তা সম্ভব হয়নি। বাধ্য হয়ে টিকে থাকার তাগিদে স্বামীর বাড়ি ফিরে যায় জাহিরা।

স্বামী মইবুর বাড়ি গিয়ে জাহিরা নিজের অবস্থানের কথা টের পায়, ততদিনে সতীন হাসিনা তার জায়গা পুরোপুরি দখল করে বসেছে। তবুও জাহিরা মইবুর সংসারে থেকে অন্য রকম এক স্বাধীনতা অনুভব করে। "মইবুর বউ হিসাবে তার কোন প্রতিষ্ঠা নেই। জাহিরারও কোন দাবি নেই এ-ব্যাপারে! পুরুষের হাতের কাছে থাকা, ইঙ্গিত ও চোখের ভাষা বুঝে স্বামীর অভিপ্রায় মেটানো এ ধরনের সম্পর্ক অথবা সেবা তাকে করতে হয়নি। এটা এক ধরনের স্বাধীনতা তার জোটে।"[৩৫] বদরাগী স্বামীর হুকুম তালিম করার জন্য তটস্থ হাসিনাকে দেখে মনে আনন্দ পায় জাহিরা। একসময় তাকেও এরকম তটস্থ থাকতে হত, সেই জীবন থেকে মুক্তির এক অন্য স্বাদ অনুভব করে টিকে থাকে জাহিরা। জাহিরার এ নিজস্ব জগতেও একসময় ফাটল ধরে। গর্ভবতী হাসিনার কাছে যৌনপরিতৃপ্তি না পেয়ে স্বামী মইবু অন্ধকার রাতে জাহিরার কাছে ছুটে আসে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে। জাহিরা জানে সে বাঁধা দিতে পারবে না, তাই নির্লিপ্ত থাকতে হয় তাকে। অথচ দিনের বেলা স্বামী তার সাথে কোনও কথা বলে না। একসময় হাসিনা একথা জানতে পেরে কৌশলে স্বামীকে দিয়ে তালাক দেওয়ায় জাহিরাকে। ফলে সংসারের অধিকার লড়াইয়ে হেরে যায় জাহিরা।

স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করলেও তালাকের পূর্বে এই সংসারে থাকার একটা অন্য অর্থ ছিল। সে জীবন দাসীবৃত্তির হলেও আশ্রয় একটা ছিল তার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে। সন্তানদের মুখ চেয়ে সে বাঁচার একটা অর্থও ছিল জাহিরার। তাই এখন তাকে স্বামীর সংসার থেকে না ফেরার ইচ্ছা নিয়েই ফিরতে হবে। কারণ- "তালাকের পর থাকাটা আর বিধি সম্মত নয়। মসজিদের মোল্লা মৌলবিরা নড়ে চড়ে উঠবে। পুকুর ধারে শুষণি শাক তোলার সময় পায়ে উঠে জোঁক নিঃসাড়ে যে রক্ত চুষে খেয়ে মোটা

হয়ে খসে পড়ত, তখনই জানতে পারতো রক্ত শুষে নিয়েছে জোঁকটা। এখন মোল্লা মৌলবিদের দিকে ঘুরে তাকালে এমনটা মনে হয় জাহিরার। মোল্লা মৌলবির কাছে তার কোন সুবিচার নেই। ব্যবস্থা যাতে কায়েম হয় সেটা এখন তারা দেখবে।"[৩৬] এক স্ত্রী বর্তমান থাকতেও কেন মইবু দ্বিতীয় বিবাহ করলো, কেনই বা বিনা কারণে প্রথমা স্ত্রী কে তালাক দিল এই প্রশ্নের জবাব জাহিরাকে দিতে অপারগ মৌলবিরা। কিন্তু তালাক প্রাপ্ত হলে সে যে আর এই সংসারে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করেও থাকতে পারবে না এ বিধান মৌলবিরা ঠিকই দেবে। জাহিরাকে তাই সন্তানদের ছেড়ে না ফেরার ইচ্ছা নিয়েই ফিরতে হয়। আর এইভাবে জাহিরার মতো নিম্নবৃত্ত পরিবারের নারীদের এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে ঠেলে দেয় সমাজপতিরা।

আফসার আমেদের 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিসসা'(১৯৯৫) উপন্যাসে তালাক নিয়ে গ্রাম সমাজের সাময়িক চটুলতা কিভাবে খড়গরূপে সুস্থ দাম্পত্যজীবনে প্রবেশ করে ভয়ংকর রূপ গ্রহন করে তার ছবি ফুটে উঠেছে। তালাক নামক প্রহসনকে কেন্দ্র করে সামাজিক মাতব্বরদের বিধানের ছোবলে একটি নারী কিভাবে পুরুষের হাতে হাতে ঘুরতে থাকে, মুসলিম গ্রাম সমাজের সেই জীবন্ত এক টুকরো ছবি এই আখ্যানে ধরা পড়েছে।

নাসিম এবং জাহানের সুস্থ স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবনে কামনা-বাসনা, চাওয়া-পাওয়া, সুখ-শান্তি, সব কিছুই উভয়কে ঘিরে আবর্ত ছিল। একদিন পুকুরে সাঁতার কাটতে গিয়ে জাহান শাড়ি হারিয়ে ফেলে। এই নিয়ে উভয়ের মধ্যে রাগারাগি হয়ে জাহান বাপের বাড়ি চলে যায়। নাসিম শশুরের ভয়ে জাহান কে আনতে যেতে পারেনা, আর জাহানও স্বামীর উপর অভিমান করে বসে থাকে। জাহান অনেকদিন না ফেরায় গ্রামের মানুষের মধ্যে রহস্য শুরু হয়। গ্রামেরই এক যুবক এই নিয়ে মিথ্যা রটিয়ে দেয় যে নাসিম জাহানকে তালাক দিয়েছে, এটা শুনে নাসিমদের বাড়ির পেয়ারা ডালে বসা হলুদ পাখি টা মারা গেছে।

এরপরই গ্রামের মাতব্বর মৌলবিরা মুসলিম পিতৃতন্ত্রের দাপট দেখাতে মাঠে নেমে পড়েছে। সকলের মধ্যে ধারণা তৈরি হয় নাসিম জাহানকে ভালোবাসে বলে বিষয়টা গোপন করতে চাইছে। তাই তারা মতামত দেয়- "তালাক দেওয়া তো অন্যায় কিছু নয়। কোরানে আছে কেতাবে আছে।"[৩৭]

নাসিম যে স্ত্রীকে তালাক দেয়নি একথা সে কিছুতেই গ্রামের মানুষজনদের বোঝাতে পারেনা। উল্টে গ্রামের স্বল্পশিক্ষিত আজমত মৌলবি নাসিমকে পরামর্শ দেয়, "একটা মেইয়াছেলার জন্য ইমান নষ্ট করার কি আছে ছোটমিয়াঁ। বউ গেলে বউ পাবে, ইমান গেলে ইমান পাবে না।"[৩৮] এরকম অন্ধ অশিক্ষিত মৌলবিদের দ্বারা সমাজদেহ কিভবে ক্ষতবিক্ষত হয় তার উদাহরণ দেখিয়েছেন লেখক। কোরানে তালাক কিংবা বহুবিবাহ নিয়ে কি নির্দেশ আছে সেই সম্পর্কে না জেনে দিব্যি ফতোয়া জারি করে চলে গ্রামের মানুষদের উপর। যে 'মেইয়াছেলার' জন্য নাসিমকে ইমান নষ্ট না করার পরামর্শ দেয়, নাসিমের সংসারে পুনরায় তাকে ফিরিয়ে আনার উপায় সরূপ হিল্লাবিবাহের মাধ্যমে সেই 'মেইয়াছেলা'কে ভোগ করার সুযোগ খুঁজেছে আজমত মৌলবি। এক সময় ও সমাজের প্রেক্ষাপটে তৈরি হওয়া আইন কিভাবে মুসলিম নারীকে আধুনিক সভ্য সমাজে এসেও হেনস্থা করে চলেছে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এটি।

ঘটনার আবর্তে তালাক না পাওয়া জাহানের আবার বিয়ে হয় এক চুড়িওয়ালার সাথে। কিন্তু সেও এক সময় ওঝা যেমন করে সাপের বিষ ঝাড়ে তেমন করে তিন তালাক দেয় জাহানকে। তালাক পেয়ে দুঃখিত জাহানের মনে হয়, "আবার আর এক পুরুষের সংসারে যেতে হবে তাকে। আবার অন্য এক পুরুষকে ভালবাসতে হবে। তার বিছানার সঙ্গী হতে হবে। পুরুষের চাওয়ার মধ্যে ধরা দেবে শুধু। এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকা যাচ্ছে না। সে যেন খেলনার মতো। কারুর ভালো লাগলে খেলে, তারপর ফেলে দেয়। অন্য একজন আবার খেলে।"[৩৯] তাই নিজেকে আর খেলার পুতুল না ভেবে মৌলবিকে বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখান করে সে। এই কাহিনীতে লেখক স্বার্থপর, ভণ্ড, কামুক চরিত্রের মৌলবি সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে আজমত মৌলবিকে নিয়ে এসেছেন। যারা ধর্মের আইনকে নিজেদের স্বার্থে বিকৃত করে।

তাই কোরানে বহুবিবাহের শর্তের কথা জেনেও মনঃকষ্টে ভোগে এই ভেবে- "এই আধবুড়া বয়সে আর একটা নিকা করা তার পক্ষে হয়ে উঠল না। অথচ আশেপাশের যত মৌলবি ইমাম আছে, তাদের বিবির সংখ্যা বেশি।"[৪০] লেখক সমাজদর্শনের অভিজ্ঞতার আলোয় বুনেছেন কাহিনিকে। তাই ধর্ম-পণ্ডিতদের ভ্রষ্টাচারের চিত্র আজমত ইমামের মুখ দিয়ে শুনিয়েছেন। গ্রাম বাংলার অত্যন্ত বাস্তব এক চিত্রকে এই আখানের নতুন আঙ্গিকে তুলে এনেছেন।

আফসার আমেদের 'দ্বিতীয় বিবি' (১৯৯৭) উপন্যাসটি মুসলিম সমাজের বহুবিবাহ প্রথার কদর্য রূপকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মুসলিম পুরুষ ইচ্ছামতো বিয়ে করে কিভাবে সহজ সরল নারীকে সতীন প্রতিযোগিতায় নিষ্ঠুর প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তোলে এই আখ্যান তার জীবন্ত দলিল। আর অপরপক্ষের নারীটিকে স্বপ্নভাঙ্গার যন্ত্রণা নিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে স্বামী সংসারে দিন যাপন করতে হয়। পুরুষের ভোগবিলাসে মাসুল দিতে হয় দুজন নারীকেই, অথচ তারা কেউই এই ঘটনার জন্য দায়ি নয়।

এই উপন্যাসের শোভান প্রথম স্ত্রী সন্তান দিতে না পারায় চুপি চুপি ঘরে নিয়ে আসে দ্বিতীয় বউ। ইসলামি আইনে প্রথমা স্ত্রী সন্তান না দিতে পারলে তার অনুমতি নিয়ে দ্বিতীয় স্ত্রী আনার পরামর্শ আছে। ঢিলেঢালা সেই আইনের সাহায্যে শোভান প্রথম স্ত্রী কিসমতের কাছে কিছু না জানিয়েই হামিদাকে বিয়ে করে সংসারে নিয়ে আসে। নিজের সংসারে অন্য এক নারীর প্রবেশ ঠেকানোর কোনও আইন কিসমতের হাতে না থাকায় স্বামীর অধিকার রক্ষার প্রতিযোগিতায় হিংস্র হয়ে ওঠে কিসমত। হিংসা ও নিষ্ঠুরতার সহায়তায় নিজের সংসারকে আঁকড়ে ধরে কিসমত। হামিদাকে সে স্বামীর ধারে কাছে যেতে দেয় না। আর অন্যদিকে সন্তান লাভের জন্য শোভানের প্রয়োজন শুধু হামিদার শরীর। স্বামীর মন রাখতে কিসমত তাকে আর একটি নিকা করার কথা অনেকবার বলেছিল। সহজ সরল মনে শোভান সন্তান পাওয়ার আশাতেই হামিদাকে নিয়ে এসেছিল। সে বোঝে নি এই বিবাহ তার সংসার থেকে সুখ শান্তি নিঃশেষ করে দেবে। ফলে মানবিক শোভনের হৃদয় রক্তাক্ত হয়ে ওঠে দিশা না পেয়ে।

এই আইনের কদর্যতায় গ্রামের সহজ সরল পুরুষের হৃদয়ও কতটা রক্তাক্ত হয় তার বাস্তব ছবি এই উপন্যাসে উপহার দিয়েছেন লেখক।

আইন মানুষের কল্যানের জন্য তৈরি হয়েছে। কিন্তু যে আইন মুসলিম নারীর জীবনকে বিপর্যস্ত করেছে সেই আইনকে স্বাগত জানাতে পারেনি কিসমত। সেকারণে প্রতিবেশি সাজেদা শরিয়তে স্বীকৃত হামিদার অধিকার সম্পর্কে কিসমতকে সচেতন করতে চাইলেও কিসমত মেনে নিতে পারেনি। এটা যে বৈধ তা "পাড়ার মোড়ল মোল্লা মৌলবিরাও বলবে। শরিয়ত বলবে, তাদের কোরান কিতাব বলবে। শুধু বলবে না কিসমত।"[৪১] তাই তার চোখের ঘুম কেড়ে নেওয়া হামিদার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে স্বামীর দখল নেয় কিসমত।

অন্যদিকে এই সংসারে হটাৎ বিপর্যয়ের মতো এসে পড়া হামিদা নিজের অবস্থান কিসমতকে কোনও ভাবে বোঝাতে না পেরে, স্বামীর অধিকারের দাবি না করেই এই সংসারের এক কোণে নির্লিপ্ত ভাবে পড়ে থাকতে চেয়েছে সমাজের কথা ভেবে। শোভানকে বিয়ে করার আগে বিধবা হামিদা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী ছিল। তবুও সমাজে নিরাপত্তা কথা ভেবে শোভানকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল সে। আবার সেই সমাজের ভয়েই শত অস্মমানের মধ্যেও এই সংসার ছেড়ে চলে যেতে পারেনি সে। সেই সমাজই হামিদা ও কিসমতদের এক স্বামিত্বে লড়াই করে বাঁচার বিধিলিপি তৈরি করে। মুসলিম স্বামীর একাধিক বিয়ে করে সখ মেটানোর আইন আছে, আইন ভাঙলে সমাজের স্নেহ দৃষ্টিও আছে। সেই আইনের শক্তিতেই হামিদাকে ভালো না বেসে তাকে ধর্ষণ করার অধিকার মুসলিম পুরুষের আছে। আবার সেই সমাজের স্বীকৃতিতেই শোভানের মতো পুরুষরা হামিদাদের ধর্ষণ করে ভাবতে পারে-"শোভান অবজ্ঞা করেছে অবহেলা করেছে তাতে মেয়ে মানুষের এত দেমাক কি? তাকেই আগলে রাখতে হয় পুরুষকে, পুরুষকে নিজের কাছে ধরে রাখার উদ্যোগ নিতে হয়।"[৪২]

মুসলিম গ্রাম সমাজের অল্পশিক্ষিত ফতোয়াদাতা মৌলবাদীদের অজ্ঞতায় সাধারণ মানুষ বিপদে পড়ে। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা আমরা লক্ষ্য করেছি আফসার আমেদের 'দ্বিতীয় বিবি' উপন্যাসের কাহিনীর মধ্য দিয়ে। দুই নারীর মধ্যে পড়ে সমস্যাকাতর শোভানও শেষ অবধি উপলব্ধি করেছে,-"মোল্লা মৌলবিরা তাকে কেউ তো বলতে আসেনি, একটা বিবি থাকতে, আর একটা বিবি নিকা করে নিয়ে আসা তোমার না জায়েজ। বরং দাওয়াত খাওয়ার জন্য তাদের জিভে জল সরছে। একজনের একটার জায়গায় দুটো, দুটোর পর তিনটে, চারটে পর্যন্ত বিয়ে হলে দাওয়াত খাওয়ার সংখ্যাও তাদের কাছে বাড়ে।"[৪৩] অথচ প্রকৃত সমাধান তারা কেউ করতে পারেনা। হাজিসাহেবদের পথ অনুসরণ করেই শোভান দুই বিবি ঘরে এনেছিল। শেষ পর্যন্ত সংসারের দুই সতীনের দন্ধে ক্রুদ্ধ হয়ে দুর্বল পক্ষের হামিদাকে মেরে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে শোভান। স্ত্রীকে ক্ষমতার বলে বাড়িছাড়া করা মুসলিম পুরুষ আইনি অধিকার বলে মনে করে। সেই অধিকার প্রয়োগ করে শোভান হামিদাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। এরকম হামিদাদের জীবন মুসলিম গ্রাম সমাজের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে। যাদের হাতে এখনও এরকম জীবন প্রতিরোধ করার আইনি সহায়তা এসে পৌঁছায়নি।

তথ্যনির্দেশ

১। হুমায়ূন আজাদ, *'নারী'* আগামী প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ, বাংলাদেশ, ২০০০, পৃ-৭০

২। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, *'অলীক মানুষ',* দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রন, আগস্ট ১৯৯৮, পৃ- ১৬

৩। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, পূর্বোক্ত, পৃ-২৭

৪। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, *'অলীক মানুষ',',* পূর্বোক্ত, পৃ-১১৭

৫। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, *'অলীক মানুষ',,* পূর্বোক্ত, পৃ-১৫৮

৬। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, *'অলীক মানুষ',* পূর্বোক্ত, পৃ-৫২

৭। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, *'অলীক মানুষ',* পূর্বোক্ত, পৃ-৫৬

৮। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, *'অলীক মানুষ',* পূর্বোক্ত, পৃ-১৪৬

৯। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, *'অলীক মানুষ',* পূর্বোক্ত, পৃ- ১৩৮

১০। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, *'অলীক মানুষ',* পূর্বোক্ত, পৃ-১১৫

১১। আবুল বাশার, *'ফুলবউ',* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ষষ্ট মুদ্রন, ১৯৯৭, পৃ-৩৫

১২। আবুল বাশার, *'ফুলবউ',* পূর্বোক্ত, পৃ -১০০

১৩। আবুল বাশার, *'ফুলবউ',* পূর্বোক্ত, পৃ-৩৭

১৪। আবুল বাশার, *'ফুলবউ',* পূর্বোক্ত, - ২৫-২৬

১৫। আবুল বাশার, *'ফুলবউ',* পূর্বোক্ত,পৃ-২৭

১৬। আবুল বাশার, *'ফুলবউ',* পূর্বোক্ত, পৃ-২৫

১৭। আবুল বাশার, *'ফুলবউ',* পূর্বোক্ত, পৃ-১০৭

১৮। আবুল বাশার,*'ফুলবউ',* পূর্বোক্ত, পৃ-১১৯

১৯। আবুল বাশার, *'ফুলবউ',* পূর্বোক্ত, পৃ-৯৫

২০। আবুল বাশার, *'ধর্মের গ্রহণ',* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রন, ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃ-১৪২

২১। আবুল বাশার,*'ধর্মের গ্রহণ',* পূর্বোক্ত, পৃ- ১৫৪

২২। আবুল বাশার, *'ধর্মের গ্রহণ',* পূর্বোক্ত, পৃ-১৫৬

২৩। আবুল বাশার, *'ধর্মের গ্রহণ',* পূর্বোক্ত, পৃ-১৭৯

২৪। আবুল বাশার,*'ধর্মের গ্রহণ',* পূর্বোক্ত, পৃ-১৯১

২৫। আফসার আমেদ, *'আত্মপরিচয়',* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯০, পৃ- ১১৮

২৬। আফসার আমেদ,*'আত্মপরিচয়',* পূর্বোক্ত, পৃ-১২৪

২৭। আফসার আমেদ,*'আত্মপরিচয়',* পূর্বোক্ত, পৃ-১৩২

২৮। আফসার আমেদ,*'আত্মপরিচয়',* পূর্বোক্ত, পৃ-১২৬

২৯। আফসার আমেদ *'আত্মপরিচয়',* পূর্বোক্ত, পৃ-১৯২

৩০। আফসার আমেদ, *'আত্মপরিচয়',* পূর্বোক্ত, পৃ-১৯৩

৩১। আফসার আমেদ,*'আত্মপরিচয়',,* পূর্বোক্ত, পৃ-১৯৪

৩২। আফসার আমেদ, *'আত্মপরিচয়',*, পূর্বোক্ত, পৃ-১৯৪

৩৩। আফসার আমেদ, *'আত্মপরিচয়',* পূর্বোক্ত, পৃ-১৯৬

৩৪। আফসার আমেদ, *'অন্তপুর',* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৩, পৃ-২৯

৩৫। আফসার আমেদ, *'অন্তপুর',* পূর্বোক্ত, পৃ-১৪৬

৩৬। আফসার আমেদ, *'অন্তপুর',* পূর্বোক্ত, পৃ-১৯৪

৩৭। আফসার আমেদ, *'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিসসা',* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৫, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৪

৩৮। আফসার আমেদ, *'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিসসা',* পূর্বোক্ত, পৃ-৪১

৩৯। আফসার আমেদ, *'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিসসা',* পূর্বোক্ত, পৃ-৭৯

৪০। আফসার আমেদ, *'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিসসা',* পূর্বোক্ত, পৃ-৮৪

৪১। আফসার আমেদ, *'দ্বিতীয় বিবি',* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৩, পৃ-৬৩

৪২। আফসার আমেদ, *'দ্বিতীয় বিবি',* পূর্বোক্ত, পৃ-৮১

৪৩। আফসার আমেদ, *'দ্বিতীয় বিবি',* পূর্বোক্ত, পৃ-৮৭

উপসংহার

মুসলিম সমাজে প্রচলিত শরিয়তি অনুশাসনের তিক্ত অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করে নারী মুক্তি আন্দোলনের যে প্রয়াস উনিশ শতকে শুরু হয়েছিল একবিংশ শতকে পৌঁছেও তা সম্পূর্ণ হয়নি। আজকের মুসলিম মেয়েরা শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিনোদন, রাজনীতি, প্রভৃতি ক্ষেত্রে ধীর গতিতে প্রবেশ করেছে। তবে শিক্ষা, স্বাধীনতা, অধিকার নারী ছিনিয়ে এনেছে ঠিকই পাশাপাশি বাল্যবিবাহ, পনপ্রথা, উচ্চশিক্ষায় বাধা, পারিবারিক নির্যাতন, তালাক, বহুবিবাহের মতো বিষয় থেকে নিজেদের একেবারে মুক্ত করতে পারেনি। এর মূলে মুসলিম পুরুষতান্ত্রিক সমাজপতিদের পুরোপুরি দায়ি করা যায় না। মুসলিম নারীরা ধর্মগুরুদের বাণীকে বিনাবাক্যেই চুপচাপ মেনে নিয়েছে, একটি প্রশ্ন তোলার মতো সাহস তারা সঞ্চয় করে উঠতে পারেনি। বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম না করলেও বাড়িতে বসে কোরান পাঠ সম্পূর্ণ করার তাগিদ বাল্যকাল থেকেই মগজে ভরে দেওয়া হয় অথচ কোরানের একটি শব্দ কোনদিন আত্মস্থ করার চেষ্ঠা করেনি। সমাজে নিজেদের অবস্থানকে মেনে নিয়েছে ধর্মের বিধান স্বরূপই। অন্তত ধর্মের মধ্যে থেকেও নিজেদের মুক্তির পথ খুঁজে নেওয়ার চেষ্ঠা করেনি। তাই শিক্ষার আঙিনায় তারা পা রাখলেও মনকে অবরোধ মুক্ত করে তুলতে পারেনি।

কিন্তু একসময়ে মুসলিম নারীরা সমাজ ও যুগের পরিবর্তনে নিজেদের অবস্থান মেলাতে গিয়ে অন্তরের তাগিদ থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছিল। হিন্দু সমাজের নারীদের পাশাপাশি থেকে উনিশ শতকের পরিবর্তনের উষ্ণ হাওয়া মুসলিম অন্তপুরে প্রবেশ করে দেরিতে হলেও তাদের জাগিয়েছিল। তারপর দীর্ঘপথ অতিক্রম করে শিক্ষালাভ, পত্রপত্রিকা সম্পাদনা, লেখালেখি, সভাসমিতি গঠন, প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমাজে নিজেদের মতো করে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিলেন। এই অধিকার প্রতিষ্ঠার কর্মযজ্ঞে তাঁরা পুরুষ সমাজের মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকেননি। বেগম রোকেয়া মুসলিম নারী জাগরণের কর্মে মুসলিম ধর্মীয় সমাজপতিদের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন, ধর্মের আঙিনাতে দাঁড়িয়েই।

তাঁর পথ অনুসরণ করে অনেক মুসলিম নারী বহুসংগ্রাম করে সেই আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। নিজেদের মুক্তির পথ খুঁজতে গিয়ে কিছু ধর্মীয়বিধান পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। তাঁদের সেই ভাবনাচিন্তাকে অন্তর থেকে সাধুবাদ জানিয়ে উনিশ শতকের মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই পত্রপত্রিকাতে লেখালিখি শুরু করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই আন্দোলনকে বৃহত্তর রূপ দেওয়ার জন্য রামমোহন, বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তির আবির্ভাব মুসলিম সমাজে হয়নি। আসলে সেইসময় মুসলিম নারীদের শিক্ষা ছাড়া অন্যান্য অধিকার সম্পর্কে সুদূরপ্রসারী ভাবনাচিন্তা করা হয়নি। বরং ইসলামি ব্যক্তিগত আইনের ছত্রছায়ায় তালাক, বহুবিবাহ, উত্তরাধিকার, প্রভৃতি আইনকে সযত্নে লালন পালন করা হয়েছে।

পরবর্তীকালে দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মতো ঐতিহাসিক ঘটনার আবর্তে সেই আন্দোলনের ধারাটা অনেকটাই ফিকে হয়ে পড়েছিল। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এপার বাংলার মুসলিম নারীরা পুনরায় অন্ধকারের পথে তলিয়ে পড়ল। বিশেষ করে দেশভাগের পর এপার বাংলায় পড়ে থাকা নিম্নমধ্যবিত্ত, দরিদ্র শ্রেণির মুসলিম নারীদের ধর্মীয় বাতাবরণ পুরোপুরি গ্রাস করেছিল। ধর্মীয় আবেগকে কাজে লাগিয়ে মুসলিম পিতৃতন্ত্র এমনভাবে নারীদের মধ্যে সেই বাতাবরণকে শক্ত করে তুলেছিল যে পরবর্তীকালে শিক্ষার প্রাঙ্গণে পা রাখলেও নিজস্ব ভাবনার জগতকে উন্মুক্ত করতে পারেনি। কিন্তু সচেতনতার স্তর যে একেবারেই ফিকে হয়ে গিয়েছিল এমনটা নয়। এই সময়ের সাহিত্যিকদের আখ্যানে উঠে এসেছে সেই সমস্ত মুসলিম নারীদের কথা যারা সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকেই প্রশ্ন তুলেছিল ইসলামি শরিয়তের বিরুদ্ধে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, আবুল বাশার এবং আফসার আহমেদের আখ্যানে যে নারীদের কথা পেয়েছি এরা সকলেই মুসলিম সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে এসেছে। এদের সকলের ভাবনার জগতটা একই, শুধু প্রতিবাদের ধরন গুলো একটু অন্যরকম ভাবে এসেছে।

সিরাজের সাইদা তাই ফরাজি পীর ধর্মগুরুর স্ত্রী হলেও নিজের ব্যক্তিত্বকে ম্লান করে দেয়নি। সাইদা ধর্মকে অস্বীকার করেনি, আর পাঁচজন মুসলিম মেয়েদের মতো ধর্মকর্মের সমস্ত নিয়মকানুন নিষ্ঠার সহিত নিয়মিত পালন করে চলে। কিন্তু তার জন্য নিজের আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে স্বামীর সকল আদেশকে বিনাবাক্যে মেনে নেয়নি। প্রয়োজন অনুযায়ী অবরোধ ভেঙে মসজিদের ভিতর ঢুকে স্বামীর হাত থেকে রাখাল বালককে বাঁচিয়েছে। পাশাপাশি রুকুও নিজের ধর্মবোধ, ঐতিহ্যের আনুগত্য নিয়েই নিজের মতো করে বাঁচার উপায় খুঁজে নিয়েছে। নাতনি কচিকে শাশুড়ি সাইদার সংগ্রামের কাহিনি শুনিয়ে কচির আত্মপ্রতিষ্ঠার রসদ যুগিয়েছে। তাই কচি পরিবারের আভিজাত্য ও সাইদার মাহাত্ম্যের পথ অনুসরণ করেই জীবনের দাবিতে ধর্মীয় ও পারিবারিক সংস্কারকে ভেঙ্গে নতুন করে চলার পথ তৈরি করে নিয়েছে। তাই আইমনিকেও তার স্বামী ত্যাগ করলে বেপর্দা স্বাধীন জীবনের দিশা খুঁজে পেয়েছে সে। মানুষের সাথে মিলেমিশে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার আনন্দ তার জীবন থেকে বঞ্চনার মলিনতা দূর করেছে। এইভাবে প্রতিবাদের পথেই যে মুসলিম নারীরা সমাজে নিজেদের অধিকার কায়েম করতে সক্ষম হবে তা দেখিয়েছেন মুস্তাফা সিরাজ।

আবুল বাশারের রাজিয়া, নবীনা এবং নাজনিন প্রত্যেকেই মুসলিম পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিধানের দ্বারা আবর্তিত। রাজিয়া স্কুলের গণ্ডিটুকু পার হয়েছে, নবীনা সেটুকুও হয়নি আর নাজনিন কোরানের দশটি অধ্যায় মুখস্ত করে হাফেজ হয়েছে। কিন্তু এদের প্রত্যেকের চিন্তাভাবনার স্তর ভীষণ পরিপক্ক। ধর্মীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকেই নিজের মতো করে যুক্তি খাঁড়া করেছে, প্রতিবাদ করেছে। রাজিয়ার জীবনে বিবাহ নামক সামাজিক প্রথা হয়ে উঠেছে বৃদ্ধ নিসার হোসেনের নোংরা যৌন উন্মেদনা পরিপূর্ণ করার আইন স্বীকৃত অধিকার। কিন্তু রাজিয়া নিসারকে সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে দেয়নি। নিজের মতো করে স্বাধীনভাবে বাঁচার জন্য রাজিয়া লড়াই করেছে পুরুষ সমাজের বিরুদ্ধে। নবীনাও পিতার অপকর্ম থেকে রাজিয়াকে মুক্ত করতে তার পাশে দাঁড়িয়েছে। নিজেও স্বামী ও প্রেমিকের প্রতারণার প্রতিবাদ করার জন্য রিয়াজের মতো বিবেকবান পুরুষের সাথে নতুন করে সংসার করার স্বপ্ন

দেখেছে। নাজনিন দশপারার কোরান হাফেজ হয়েও নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছে শরিয়তি অনুশাসনের নোংরা বিধানকে। স্বামীর কাছ থেকে তালাক প্রাপ্ত হয়ে হিল্লাবিবাহের মতো নিকৃষ্ট পথ না মাড়িয়েই স্বামীর সংসারে ফিরেছে নাজনিন। মুসলিম ধর্মভিত্তিক সমাজের অনুশাসন থেকে একমাত্র নাজনিন রেহাই পেয়েছে। রাজিয়া এবং নবীনা দৃপ্ত কণ্ঠে সমাজের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলে শেষ অবধি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। আসলে রাজিয়া নবীনা যে মুসলিম সমাজে অবস্থান করে সেখানে দাঁড়িয়ে দুজনের পক্ষে বৃহত্তর কোনও পরিবর্তন আনা সম্ভব ছিলনা। কিন্তু তারা সমাজের সাথে আপোষ করে নেয়নি। নিজেদের ধর্মীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধে দাড় করিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মুসলিম নারীদের সমাজের অচলায়তন ভাঙ্গার আহ্বান জানিয়েছে।

আফসার আহমেদ মুসলিম সমাজে প্রচলিত বহুবিবাহ, সতীন, তালাক, প্রভৃতি সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত চিত্র এঁকেছেন। মুসলিম সমাজের একগুচ্ছ নারীদের কথা তাঁর আখ্যানে পেয়েছি। জীবনের টানাপোড়নে পড়ে সকলেই লাঞ্ছিত, অপমানিত, বঞ্চিত হয়েছে। এরা বেশিরভাগই নিম্নবিত্ত মুসলিম সমাজের নারী, শিক্ষার আঙিনায় কেউই পা রাখেনি। একমাত্র 'আত্মপরিচয়' এর মালেকা মুসলিম সমাজের প্রভাবশালী বাড়ির শিক্ষিতা বউ। কিন্তু সকলের যন্ত্রণার জায়গাটা এক, ইসলামি শরিয়তি বিধানের চাবুকে প্রত্যেকে অত্যাচারিত। তাই মালেকা হাজিবাড়ির প্রচলিত অন্ধসংস্কার থেকে মুক্তি পেতে স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করেছে। 'অন্তপুর' এর জাহিরা অত্যাচারী স্বামীর কাছ থেকে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে মাসুদের সাথে তৈরি করে নিয়েছে নিজস্ব স্বপ্নের জগত। 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিসসা' আখ্যানের জাহান মিথ্যা তালাকের ঘটনায় একাধিক পুরুষের হাতে খেলার পুতুলে পরিণত হয়ে শেষ অবধি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। 'দ্বিতীয় বিবি' তে কিসমত নিজের অধিকার বজায় রাখতে গিয়ে হয়ে পড়েছে নিষ্ঠুর অত্যাচারী এক নারী। আর কিসমতের সংসারে উটকো ঝামেলা হয়ে ঢুকে পড়ে হামিদা স্বামী সতীনের নির্যাতন, লাঞ্ছনার স্বীকার হয়ে পড়েছে। তাই সে স্বামীকে সামাজিকভাবে অস্বীকার করতে না পারলেও শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রত্যাখ্যান করে প্রতিশোধ নিয়েছে।

আফসার আহমেদ তাঁর আখ্যানে যেসমস্ত নারীদের কথা বলেছেন এঁরা প্রত্যেকে সমাজের বিধানে জর্জরিত। প্রতিবাদ করেছে সকলে নিজেদের মতো করে। তবে একমাত্র মালেকা হয়ে উঠেছে বলিষ্ঠ প্রতিবাদী এক নারী। বাকি সকলের প্রতি লেখক সহনাভূতি দেখিয়েছেন, তাদের মানসিক যন্ত্রণার শরিক হয়েছেন। তবে মালেকাকে প্রতিবাদী নারী হিসাবে পেয়েছি অন্য কারণে। এদের মধ্যে মালেকাই একমাত্র শিক্ষিতা, সমাজ সচেতন একজন নারী। এই মালেকাও একসময় হাজিবাড়ির সব প্রথা চুপচাপ মেনে নিয়েছিল। মালেকার অন্তরসত্তা জেগে উঠেছে দুটো কারণে। প্রথমত, মালেকা হাজিবাড়ির সেজবউ শায়েরাকে দেখেছে কিভাবে সংস্কার ভাঙতে হয়। শায়েরা হাজিবাড়ির অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে গিয়ে খুন হয়েছে। শায়েরার হত্যা শান্ত আত্মসমর্পণকারী মালেকাকে হাজিবাড়ির অমানবিক পরিবেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলেছে। দ্বিতীয়ত, হাজিবাড়িতে নিয়মিত আসা পত্রিকা থেকে মালেকা শাহবানু মামলার পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের রায় পড়েছে। সুপ্রিম কোর্ট শাহবানু মামলায় খোরপোষ প্রদানের রায় ঘোষণা করলে আর্থিক নিরাপত্তার ভরসা মালেকাকে হাজিবাড়ির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে সাহস জুগিয়েছিল। অন্যদিকে জাহিরা এবং জাহান মালেকার মতো সমাজ সচেতন শিক্ষিতা নারী নয়। তারা অন্তপুরের ঘেরাটোপে আবদ্ধ, বাইরের জগতের হাওয়া সেখানে পৌঁছায় না। আর কিসমতদের হাতে স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ আটকানোর মতো কোনও আইনি অধিকারই তৈরি হয়নি। মুসলিম মেয়েদের এই সচেতনতা বাড়ানোর জন্য শিক্ষার প্রয়োজন সব থেকে আগে। সর্বস্তরের মুসলিম মেয়েরা শিক্ষিত না হলে তাদের প্রগতিও সম্ভব নয়। তাই তালাক, বহুবিবাহ, কিংবা উত্তরাধিকার প্রশ্নে ইসলামি আইনের পরিবর্তন হলেও তার প্রয়োগ সম্পর্কে মুসলিম মেয়েরা যদি সচেতন না হয় তাহলে আইনের অধিকার সংবিধানের পৃষ্ঠাতেই আটকে থাকবে। তার দ্বারা মুসলিম সমাজের মেয়েদের বৃহৎ কোনও পরিবর্তন সাধিত হবে না।

কথাসাহিত্যের এই ক্ষুদ্র পরিসরে যে কয়েকজন নারীর কথা পেয়েছি এরা সকলে মুসলিম সমাজের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে থাকা নারীদের প্রতিনিধি। ধর্মীয় বিধানের বিরুদ্ধে প্রত্যেকের চাঁপা ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। কেউ লাঞ্ছিত জীবন থেকে মুক্তির পথ খুঁজেছে, কেউ দৃপ্ত কণ্ঠে প্রতিবাদ করেছে।

আবার কেউ মানসিকভাবে হয়ে উঠেছে হিংস্র, রক্তাক্ত। প্রত্যেকেই ধর্মকে সম্মান করে, পালনও করে। তাই সকলেই প্রশ্ন তুলেছে ধর্মীয় বিধানের বিরুদ্ধে, ধর্মের বিরুদ্ধে নয়। নিজেদের অধিকার, সম্মান প্রতিষ্ঠা করতে হলে যে মুসলিম নারীর সামাজিক অধিকারের সাথে যুক্ত ধর্মীয় বিধানের পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে তা তারা বুঝতে পেরেছে। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা হাদিসেও রয়েছে। 'অলীক মানুষ' উপন্যাসের সাইদা রুকুকে শুনিয়েছিল পয়গম্বর যুগের এক তেজস্বী নারী নুসাইবা খাতুনের কথা। নুসাইবা খাতুন কোরানে নারীর অধিকার স্থাপনের জন্য মহম্মদের কাছে প্রশ্ন তুলেছিলেন খোদা কেন শুধু পুরুষদের উদ্দেশ্যে কথা বলেন, নারীরা কি মানুষ না? তাহলে নারীদের জন্য কেন বার্তা আসেনা কোরানে? নুসাইবার এই প্রশ্নের অর্থ মহম্মদ বুঝেছিলেন, এবং তারপর থেকেই কোরানে নারী পুরুষ উভয়ের জন্য বার্তা আসতে শুরু করে। সে যুগে নুসাইবা খাতুন যেমন করে কোরানে মেয়েদের অধিকার স্থাপন করেছিল এযুগেও রোকেয়ারা শিক্ষার অধিকার স্থাপনের জন্য সমাজের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছে। পার্থক্যটা হল নুসাইবার কথা যত সহজে হজরত মহম্মদের মতো জ্ঞানী পুরুষ অনুভব করেছিলেন তত সহজে এযুগের ধর্মগুরুরা রোকেয়াদের কথা অনুভব করতে অপারগ। এযুগের মেয়েরা পয়গম্বরের যুগে বাস করে না তাই তাদের অধিকার আদায়ের লড়াইতে একজন নুসাইবা নয় অনেক রোকেয়াদের মিলিত কণ্ঠস্বর প্রয়োজন।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা. *'অলীক মানুষ',* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ মুদ্রণ, আগস্ট ১৯৯৮

বাশার, আবুল. *'ফুলবউ',* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৯৯৭

বাশার, আবুল. *'ধর্মের গ্রহণ',* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, তৃতীয় মুদ্রন, ফেব্রুয়ারি ২০০০

আমেদ, আফসার. *'আত্মপরিচয়',* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯০

আমেদ, আফসার. *'অন্তপুর',* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৩

আমেদ, আফসার. *'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিসসা',* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৫

আমেদ, আফসার. *'দ্বিতীয় বিবি',* দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৩

সহায়ক গ্রন্থ

দত্ত, অমর. *'ডিরোজিও ও ডিরোজিয়ানস',* কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৬

দত্ত, অমর. *'উনিশ শতকের মুসলিম মানস ও বঙ্গভঙ্গ',* কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৫৮।

দে, অমলেন্দু. *'বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ',* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পরিষদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯১

শিকদার, অশ্রুকুমার. *'ভাঙ্গা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য',* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০০৫

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত. *'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*(খ্রীষ্টীয় দশম-বিংশ শতাব্দী), কলকাতা: মুদ্রণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, নতুন সংস্করণ ২০০৬-২০০৭

হোসেন, আনোয়ার. *'স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিম নারী'(১৮৭৩-১৯৪৭),* কলকাতা: প্রগতিশীল প্রকাশক, প্রথম প্রকাশ মে ২০০৯

ইসলাম, আমিনুল. *'সত্যের সন্ধানে মুসলিম সমাজ',* কলকাতা: বিশ্ব বঙ্গীয় প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ২০০৬

আহমেদ, আফসার. '*মুসলমান সমাজ : নানাদিক',* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১

হোসেন, ইমরান. '*বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী : চিন্তা ও কর্ম',* ঢাকা: বাংলা একাডেমী প্রেস, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩

আহমেদ, ওয়াকিল. *'উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা'*(দ্বিতীয় খণ্ড), ঢাকা: বাংলা একাডেমী প্রেস, ১৯৯৭

আনিসুজ্জামান. *'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*(১৭৫৭-১৯২৮), বাংলা একাডেমী, ঢাকা: তৃতীয় সংস্করণ ১৯৮৩

খাতুন, আফরোজা. *'বাংলা কথাসাহিত্যে মুসলিম অন্তপুর',* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা: ২০১১।

খাতুন, আফরোজা. *'মেয়ে তুমি এবং আমরা',* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ২০১৬

ছফা, আহমদ. *'বাঙালী মুসলমানের মন',* ঢাকা: বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ১৯৮১

শরীফ, আহমদ. *'বাঙালীর চিন্তাচেতনার বিবর্তনধারা',* ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৭

বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র. *'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদবিষয়ক প্রস্তাব দ্বিতীয় পুস্তক'* (বিদ্যাসাগর রচনাবলী, তীর্থপদ দত্ত সম্পাদিত), কলকাতা: তুলি কলম, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৭

আজাদ, হুমায়ূন. *'নারী',* বাংলাদেশ: আগামী প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০০

মুরশিদ, গোলাম. *'নারী প্রগতি : আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী',* কলকাতা: নয়া উদ্যোগ, প্রথম সংস্করণ ২০১৪

মুরশিদ, গোলাম. '*রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া : নারী প্রগতির একশো বছর',* ঢাকা: অবসর প্রকাশনা, প্রথম প্রকাশ

নাহার, সামসুন. *'বাংলা উপন্যাসে মুসলিম নারী',* কলকাতা: আভিযান পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৭

শাহীন আখতার ও মৌসুমী ভৌমিক(সম্পাদিত). *'জানানা মহফিল',* স্ত্রী, কলকাতা: প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮

সিরাজুল হক, খোন্দকার. *'মুসলিম সাহিত্য ও সমাজ',* বাংলা একাডেমী, ঢাকা: ১৯৮৫

মল্লিক, সুনন্দা.*'মুসলিম নারী প্রগতির প্রেক্ষিতে মুসলিম মানসের অন্বেষণ'*(বাংলা কথাসাহিত্যে মুসলিম মানস), কলকাতা: দীপন প্রকাশনা, ২০১০

বাগচী, যশোধরা ও, ভাদুরী অনিন্দিতা(সম্পাদিত). *'মেয়েদের চোখে আইন আইনের চোখে মেয়েরা',* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও মানবীবিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ ২০০১

রহমান, গাজী শামসুর. *'স্যার আবদুর রহীম-ইসলামী আইনতত্ত্ব',* ঢাকা: ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম সংস্করণ ১৯৮০

হাসান, মইনুল. *'ইসলামী আইন',* ঘটকপুকুর: উদার আকাশ, ২০১৮

রহমান, ডঃ মহঃ মসিহুর. *'ইসলামে নারীর অধিকার* কলকাতা: বিশ্ববঙ্গীয়, প্রথম প্রকাশ ২০১৭

জওহর, মাওলানা মোবারক করীম. (অনুবাদক), *কোরান শরীফ,* কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪

শরীফ, অধ্যক্ষ ইয়াকূব. (অনুবাদক), *আবু দাউদ শরীফ,* (প্রথম খণ্ড) ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ ১৯৯০

মাসুদ, মাওলানা ফরীদ উদ্দীন. (অনুবাদক). *'তিরমিযী শরীফ',* (তৃতীয় খণ্ড), ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫.

ইয়াসিন,তাহা. ও সাদি, অনুপ.(সম্পাদনা), *'নারী',* ঢাকা: কথাপ্রকাশ, প্রথম প্রকাশ ২০০৮

গিয়াসুদ্দিন. *'ইসলাম ধর্ম ও যুক্তি',* কলকাতা: ক্যাম্প, প্রথম প্রকাশ ২০১৪

বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী. *'ধর্ম ও নারী : সেকাল ও একাল',* কলকাতা: এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৮

মুখোপাধ্যায়, জগমোহন. *'গবেষণা পত্র অনুসন্ধান ও রচনা',* কলকাতা: আনন্দ, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১২

হাসান, জাহিরুল. *'মুসলমানকোষ',* কলকাতা: পূর্বা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৪

হাসান, জাহিরুল. *'বাংলায় মুসলমানের আটশো বছর',* কলকাতা: পূর্বা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১২

ভাদুড়ি, তন্দ্রিতা.*'পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় : পুরুষের স্বৈরতান্ত্রিক বিশ্লেষণে নারী,* কলকাতা: রিডার্স সার্ভিস, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০০৫

ভট্টাচার্য, তারকনাথ.*'গবেষণা তথ্য ও প্রয়োগ',* কলকাতা: প্রজ্ঞাবিকাশ, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১২

আচার্য, দেবেশ কুমার. *'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'(আধুনিকযুগ ১৯৫০-২০০০),* কলকাতা: ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০১০

হাসান, মইনুল. *'মুসলমান সমাজে সংস্কার আন্দোলন',* কলকাতা: মৃত্তিকা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৫

হাসান, মইনুল. *'মুসলিম সমাজ: কয়েকটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা',* কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, চতুর্থ মুদ্রন সেপ্টেম্বর ২০০৫

হবিবুল্লাহ, মনসুর. *'মুসলিম নারীর অধিকার প্রসঙ্গে',* সম্পাদক সরোজ মুখোপাধ্যায়, কলকাতা: ১৯৮৬

নাহার, মীরাতুন. *'দেশকন্যার কলমে',* কলকাতা: এবং মুশায়েরা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১২

নাহার, মীরাতুন. *'সংখ্যালঘু মানবী আমি',* কলকাতা: গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০১২

বাগচী, যশোধরা. *'নারী ও নারীর সমস্যা',* কলকাতা: অনুষ্টূপ, প্রথম প্রকাশ ২০১২

খান, লায়েক আলি. *'বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সমাজ ও চরিত্র',* কলকাতা: সাহিত্যলোক, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০০

শাহিন আখতার (সম্পাদিত) *'স্বতী ও স্বতন্তরা : বাংলা সাহিত্যে নারী'* (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড), কলকাতা: প্রতিভাস, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১২

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার. *'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'* কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সি, পুনমুদ্রণ ২০১০-২০১১।

সেন, সুকুমার. *'ইসলামি বাংলা সাহিত্য',* কলকাতা: আনন্দ, চতুর্থ মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৩

সিদ্দিকা, ফারজানা. *'নারীর সৃষ্টি : নারীর দ্বন্দ্ব'* ঢাকা: কথাপ্রকাশ, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৮।

উল্লাহ, সা'দ. *'নারীর অধিকার ও আইন'* বাংলাদেশ: সময় প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ২০০২।

আমিন, সোনিয়া নিশাত. *'বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন',* অনুবাদ পাপড়ীন নাহার, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ২০০২।

হোসেন, সেলিনা. *'নারী বিশ্ব'* (সম্পাদনা : বরেন্দু মণ্ডল), কলকাতা: অভিযান পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৯।

আচার্য, সৃজিত. *'বাংলায় ইসলাম ধর্মের সূচনাপর্ব',* কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ ২০০৪।

সহায়ক পত্র-পত্রিকা

ঐক্য পত্রিকা, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ সংখ্যা, গৌরিশংকর সরকার সম্পাদিত, হাবিবপুর, পশ্চিম মেদনীপুর: অক্টোবর ২০১৩।

প্রথম আলো, বিভাগ-নারীমঞ্চ, ঢাকা, বাংলাদেশ: জানুয়ারি ২০০৩।

সৃজন, বিশেষ সংখ্যা বেগম রকেয়া, লক্ষণ কর্মকার সম্পাদিত, কুশপাতা, ঘাটাল, পশ্চিম মেদনীপুর: ডিসেম্বর ২০০৭।